বিশাইসিদ্ধ

বিক্রমজিৎ মিশ্র



১

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়, যা কখনওই কাউকে খুলে বলা যায় না। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না সেসব অলৌকিক ঘটনার কথা। বেশিরভাগ মানুষই হেসে উড়িয়ে দেয়। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সেসব ঘটনার সঙ্গে মর্মান্তিক কোনও স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, তখন সেই হাসি তামাশাগুলো বড় যন্ত্রণা দেয়। আমি সাধারণ একজন মানুষ, কিন্তু আমার এই সাধারণ জীবনের মধ্যেও একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি আজও কাঁটার মতো আমার বুকে বিঁধে আছে। যা আজও একই রকম ভাবে আমাকে যন্ত্রণা দেয়। সেই স্মৃতি ভুলে যাওয়ার নয়, ভুলতে পারলে হয়তো এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম। এই কাহিনি কাউকে বলার মতো সাহস কখনও হয়নি। পাছে লোকে এটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। যে যন্ত্রণা আমাকে আজীবন বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে সেই ঘটনার কথা কেন ডায়েরিতে লিখে রাখছি তা-ও আমার জানা নেই। হয়তো আগামী দিনে কেউ এই লেখা পড়বে, হয়তো সে আমার অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা উপলব্ধি করতে পারবে। যা আমি কখনও কাউকে বলতে পারিনি, আমার সেই যন্ত্রণাময় অতীতের কথা পড়ে কেউ যদি আমার সমব্যথী হয়ে উঠতে পারে তাহলে সেটাই হবে আমার সবথেকে বড় সান্ত্বনা।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত অযোধ্যা পাহাড় থেকে কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা গ্রামে। আমি তখন পুরুলিয়াতেই থাকতাম, একটা নড়বড়ে গ্যারেজ

চালাতাম ঝালদাতে। আর মাঝে মাঝে এক্সট্রা ইনকামের জন্য লরি, ট্রেলার, ট্যুরিস্ট বাস চালাতাম। পুরুলিয়া আমার ভীষণ প্রিয় একটা জেলা। ওখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষজন এবং ভাষা— সব কিছুই আমার বড় প্রিয়। আরও একটা জিনিস আমার বড় প্রিয় ছিল, আমার জঙ্গলবাড়ি।

বুরদা নামের একটা জায়গার কাছে জঙ্গলের মধ্যে ওই ফাঁকা বাড়িটি জোগাড় করতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা নিস্তব্ধ, নির্জন ওই বাড়িটি আমাকে যেন মন্ত্রবলে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

বাড়িটির দক্ষিণ দিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মাইল তিনেক গেলে কাঁড়বাঁধি গ্রাম। উত্তরে মাইল দুয়েক গেলেই চাটুমধুড় গ্রাম, তার আরও খানিকটা উত্তরে নড়াহাড়া ড্যাম। পূর্ব দিকে প্রায় পুরোটাই জুড়ে আছে অযোধ্যা পাহাড় এবং সংলগ্ন রিজার্ভ ফরেস্ট।

বাড়িটার থেকে একটু দূরেই একটা পাথরের খাদান ছিল, এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওই পাথর খাদানের কর্মচারি আর ট্রাক ড্রাইভারদের থাকার জন্য এই বাড়িটা বানানো হয়েছিল। খাদান বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে বাড়িটা খালিই পড়েছিল। এমন লোকবর্জিত জায়গায় কে-ই বা থাকতে আসবে। আমার পরিচিত এক ড্রাইভারের কাছে বাড়িটার সন্ধান পেয়ে দেরি না করে ছুটে গিয়েছিলাম বাড়ির মালিক দ্বিজেন মাহাত-র কাছে। ভদ্রলোক তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে ওই বাড়ি কেউ ভাড়া চাইতে পারে। বাড়িটার এমনিতেই এলাকায় খুব দুর্নাম, পরপর তিনজন মানুষের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে ওই বাড়িতে। প্রথমজন ওই পাথর খাদানের সুপারভাইজার, দ্বিতীয়জন এক ট্রাক ড্রাইভার, আর তৃতীয়জন ওই খাদানের একটি আদিবাসী লেবার। আমি সব জেনেও ওই ভুতুড়ে বাড়িতে একা থাকতে চাইছি শুনে তো পত্রপাঠ আমাকে বিদেয় করে দিলেন। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিইনি, বারবার ওঁর বাড়ি গিয়ে অনেক বুঝিয়ে, অনুরোধ করে

শেষমেশ রাজি করালাম।

কিন্তু উনি বাড়িটা ভাড়া দিলেন না, আমাকে একেবারে বিক্রিই করে দিলেন। বললেন, "দেখো বাবা, ওই বাড়িতে তিনটে অপমৃত্যু ঘটেছে, আর প্রতিবার আমাকে থানা-পুলিশের ঝামেলায় জড়াতে হয়েছে। এই বুড়ো বয়েসে আর ওইসব ঝামেলায় জড়াতে চাই না। বাড়িটা তুমি কিনেই নাও।"

বুঝলাম, ভদ্রলোক দায়মুক্ত হতে চাইছেন। অবশ্য তাতে আমার সুবিধেই হয়ে গেল। আমি সারাদিনের ব্যস্ততা আর হাড়ভাঙা খাটুনির পরে প্রকৃতির মাঝে বিশ্রাম নিতে পারব, এর থেকে বেশি আর কী চাই। ওঁর প্রস্তাবে আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে নিজস্ব একটা বাড়ি হলে আমাকে আর পায় কে! নির্জনে একলা নিজের মতো করে থাকতে পারব, জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে পাখ-পাখালিদের সঙ্গে দিব্যি সময় কেটে যাবে। সারাদিন গ্যারেজে লোহা পিটে সন্ধ্যের সময় জঙ্গলবাড়িতে ফিরে প্রকৃতির কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারব। আগামী দিনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা মনে মনে কল্পনা করে আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে টাকা পয়সারও জোগাড় হয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, তিনবছর গ্যারেজ চালিয়ে যা কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম তার পুরোটাই বেরিয়ে গেল বাড়িটা কিনতে গিয়ে। কিন্তু বাড়িটা রেজিস্ট্রি হয়ে যাবার পর দ্বিজেন মাহাত যখন আমার হাতে সমস্ত কাগজপত্র তুলে দিলেন, তখন আনন্দে আমার মন একেবারে নেচে উঠল।

মাত্র দু' লাখ টাকায় আড়াই বিঘে জমি সমেত ওই বাড়ি রীতিমতো জলের দরেই পেয়েছিলাম বলা যায়। একতলা বাড়ি, তিনটে বড় বড় ঘর আর বারান্দা। বাইরে কুয়ো আর বাথরুম। বাউন্ডারি একটা আছে বটে, কিন্তু পিছনে জঙ্গলের দিকটায় জায়গায় জায়গায় পাঁচিল ভেঙে পড়ে গেছে। কোনও এক সময় হাতির পাল এসে পাঁচিল ভেঙে ঢুকে ভিতরের কলা গাছ খেয়ে গিয়েছিল। তারপর আর তা মেরামত করা হয়নি। পিছন দিকে একটু বাগান মতো ছিল এক কালে, কিন্তু এখন বুনো ঝোপঝাড়ে সেসব ঢাকা

পড়ে গেছে। সামনের দিকে অনেকগুলো সেগুন গাছ লাগানো হয়েছিল আগে, এখন সেগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। এছাড়াও অর্জুন, মহুয়া এবং কেঁদ গাছও আছে অনেকগুলো। বিশাল বিশাল সেইসব গাছের ছায়ায় পুরো বাড়িটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। ওই গাছগুলোর দামই বেশ কয়েক লাখ টাকা হবে। দ্বিজেন মাহাত এত কম দামে এরকম একটা বাড়ি কেন বিক্রি করে দিলেন, সেটাই আমার মাথায় ঢুকছিল না। এই বাড়িটাই যদি আমি টাউন এলাকায় কিনতাম তাহলে ৫০-৬০ লাখ টাকাতেও পেতাম না।

বাড়ির পিছন দিক থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। শাল, মহুয়া, অর্জুন, কেঁদ, ঘোড়ানিম আর পলাশ গাছগুলো দিনের বেলাতেও পুরো এলাকাটা অন্ধকার করে রাখে। হাতির পাল মাঝেমধ্যে এলেও তারা আর এই বাড়ির বাউন্ডারির ভিতরে ঢোকে না। তবে রাতের বেলায় শেয়াল বা হায়েনা প্রায় প্রতিদিনই চলে আসে। পিছন দিকে ভাঙা পাঁচিলের ওদিকে একটা ঝোপের মধ্যে একজোড়া ভালুক বাসা করেছে, বিকেলে জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে ফেরার সময় ওদের দেখলাম। এবার থেকে একটু সাবধানে হতে হবে, ভালুক বড় সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণী! ওদের বাচ্চা হলে ওরা খুব আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। বছর খানেক আগে এই অযোধ্যা পাহাড়েই আমি তার প্রমাণ একবার পেয়ে গেছি। আমার পেটে এবং বুকে ভালুকের নখের আঁচড়ের দগদগে দাগগুলো এখনও মিলিয়ে যায়নি। এদিকের মহুয়া গাছগুলোতে সবে ফুল আসতে শুরু করেছে। মহুয়ার লোভে ভালুক দুটো দেখলাম মহুয়া গাছগুলোর নীচেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের নজর এড়িয়ে কোনও রকমে পালিয়ে এলাম। জঙ্গলে তো আর মানুষের নিয়ম খাটে না, জঙ্গলের নিয়ম আলাদা। এখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে না পারলে মুহূর্তে প্রাণসংশয় হয়ে যাবে। কিন্তু জঙ্গলে থাকার অভিজ্ঞতা আমার বহু আগের থেকেই আছে, তাই কিছুদিনের মধ্যেই আমি জঙ্গলবাড়ি এবং জঙ্গলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইক বা জিপ

নিয়ে গ্যারেজে চলে যাই, সারাদিন সেখানেই কেটে যায়। তারপর গ্যারেজের ছেলেদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বিকেলের দিকে ফিরে আসি জঙ্গলবাড়িতে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জঙ্গলের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াই, মাঝেমধ্যে ছোটখাটো শিকারও করি। ফাঁদ পেতে বুনো খরগোশ, বনমোরগ, হরিয়াল, সজারু ইত্যাদি ধরে নিয়ে ভোজ লাগিয়ে দিই।

এই বাড়িটার মধ্যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই অমোঘ আকর্ষণে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়লাম।

২

আজ প্রায় একমাস হয়ে গেল বাড়িটায় এসেছি, এসে অবধি কোনও সমস্যা হয়নি। যেসব দুর্নাম শুনেছিলাম বাড়িটার—সেগুলো হয়তো গ্রামের মানুষের কল্পনা ছিল। আমি তো আসার পর থেকে কিছুই দেখতে পেলাম না।

সকালে উঠেই বাইক নিয়ে ঝালদা চলে যাই, সারাদিন গ্যারেজে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময় ফিরে আসি। কোনও দিন রান্না করি আবার কোনও দিন খাবার কিনে নিয়ে আসি। রাত্রিবেলায় বারান্দায় বসে গল্পের বই পড়ি আর নাহলে বাইরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়েই সময় কেটে যায়। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগত, কিন্তু ধীরে ধীরে এই জঙ্গলের পরিবেশে মানিয়ে নিয়েছি নিজেকে। এই একাকীত্ব আমার প্রয়োজন ছিল, জীবনটাকে আবার নতুন করে শুরু করার জন্যই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি জীবন প্রবাহ থেকে।

তিনটে ঘরের মধ্যে একটাই আমি ব্যবহার করি, বাকি দুটো তালা বন্ধ থাকে। কতকটা ইচ্ছে করেই আমি পশ্চিমের এই ঘরটাতে থাকি। এই ঘরেই নাকি ওই অঘটনগুলো ঘটেছিল। প্রথম প্রথম একটু গা ছমছম করত, কিন্তু প্রায় একমাস কাটানোর পর বুঝে গেছি যে এই বাড়িতে আর যা-ই থাকুক ভূত-প্রেত

কিছু নেই। থাকলেও অবশ্য আমার কোনও আপত্তি ছিল না। এই নিস্তব্ধ নির্জনে দুটো কথা বলার মতোও তো কেউ নেই। গ্রামগুলোও অনেকটাই দূরে, আর গ্রামের লোকজনও ভূতের ভয়ে এদিকে কেউ আসে না। ভূত-প্রেত থাকলে আমার সুবিধেই হতো।

এমন করেই কিছুদিন যাবার পর একদিন আমার গ্রামের দুই বন্ধু তাতান আর রাজা আমাকে ফোন করে জানাল যে ওরা অযোধ্যা পাহাড় ঘুরতে আসার প্ল্যান করছে। ওরা জানত যে আমি অযোধ্যা পাহাড়ের কাছেই কোথাও থাকি। তাই আমাকে খুব করে ধরল, ওদের ভালো করে সব ঘুরিয়ে দিতে হবে। ছোটবেলার বন্ধু বলে কথা, ওদের ইচ্ছে পূরণ করতেই হবে।

গ্রামে আমরা তিনমূর্তি ছিলাম, সবাই বলত— ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। উফফ! সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে এখনও মনটা আনন্দে ভরে যায়। কতদিন পর আবার ওদের সঙ্গে দেখা হবে! সেজন্য আমিও এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। রাজা তো আমার মতোই ড্রাইভার, ওর সঙ্গে তবুও এক আধবার দেখা হয়। কিন্তু তাতান পুণায় একটা কোম্পানিতে চাকরি করে, বহুদিন ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়নি। অযোধ্যা আসার প্ল্যানটা তাতানের, ছুটিতে এসে ও-ই রাজাকে বলে এই প্ল্যানটা ঠিক করেছে। ওরা আমার কাছে এসে ক'টা দিন থাকতে চায়, জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। ক'দিন একসঙ্গে থেকে জমিয়ে আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া আর হইহই করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আমি বলেই দিলাম, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোরা আমার এখানে চলে আয়, তারপর বাকিটা আমিই বুঝে নেব।"

হায় রে, সেদিন যদি ওদের বারণ করতাম!

কথা হয়েছিল শনিবার দিন ওরা পুরুলিয়া টাউন থেকে গাড়ি ভাড়া করে এসে সারাদিন অযোধ্যা পাহাড় ঘুরবে এবং রাতে আমার ডেরায় থাকবে। রবিবার আমার এদিকের জঙ্গল পাহাড় ঘুরে সোমবার সকালে বাঁকুড়া ফিরে যাবে।

সেই মতো শনিবার বিকেলে বাঘমুণ্ডি গেলাম ওদের নিয়ে আসার জন্য। সারাদিন পাহাড়ে ঘুরে ওদের তখন হা-ক্লান্ত অবস্থা।

আমি একটা টাটা সুমো নিয়ে গিয়েছিলাম গ্যারেজ থেকে, তাই ওদের ভাড়ার গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

ওরা এই প্রথম এদিকে এলো, এর আগে জঙ্গল সেভাবে দেখেনি কখনও। আসার সময় তাই ওদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এলাম। জানতাম, ওদের খুব ভালো লাগবে।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় যে কোনও জঙ্গলই ভীষণ মোহময় হয়ে ওঠে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি এসে আলোছায়ায় এক বিচিত্র নকশা তৈরি করে। বড় বড় শাল মহুয়ার গাছগুলো মনে হয় যেন ছবিতে আঁকা, স্থির এবং মৌন। বাসায় ফেরা পাখিদের মিলিত কলরবে সারাটা জঙ্গল মুখর হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির সেই মৌনমুখর রূপ দেখে যে কোনও মানুষই প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য। আসলে আমরা যতই আধুনিক হয়ে যাই না কেন, আমরা তো এই প্রকৃতিরই সন্তান। তাই যখনই প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসি তখনই আমাদের মধ্যে সেই নাড়ির টান ফিরে আসে এবং আমরা প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাই। শহরে আধুনিকতা আমাদের জামা-প্যান্ট পরিয়ে সুসভ্য বানালেও প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আমরা আমাদের ভিতরের সেই উলঙ্গ আদিম মানুষটিকে খুঁজে পাই, যে একদিন এই প্রকৃতির মধ্যেই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই শুরু করেছিল। তখন মনটা বড় উদাস হয়ে যায়।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট নালার কাছে হাতির পাল দেখে গাড়িটা দাঁড় করালাম। নালার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা হাতির পাল দেখে তাতান আর রাজা তো ভয়েই অস্থির, কিছুতেই গাড়ি থেকে নীচে নামবে না। একটু ধাতস্থ হতেই রাজা গাড়ির ভিতর থেকে ক্যামেরায় হাতিদের ছবি তুলতে শুরু করল।

তাতান ভয়ে ভয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, হাতিগুলো আমাদের দিকে তেড়ে আসবে না তো?"

ওকে আশ্বস্ত করলাম, এখন হাতিরা বিশ্রাম করবে জঙ্গলের মধ্যে। তবে ওদের বিরক্ত করলে ওরা খেপে গিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। আমাদের কথার মধ্যেই হাতিগুলো ধীরে ধীরে গভীর

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল।

নালা পেরিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা হরিণের পালকে দেখলাম, এলোপাথাড়ি ছুটে আর লাফ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের জঙ্গলে চলে গেল। এত সামনে হরিণের পাল দেখেও ছবি তুলতে না পেরে রাজার সেকি আফসোস।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমার জঙ্গলবাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে চারিদিক আলো করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের অবস্থা দেখে মনে হলো রাত্রে খুব জোর বৃষ্টি হতে পারে।

আসার সময় বাঘমুণ্ডিতেই বাজার করে নিয়েছিলাম। রাত্রে রান্নার বেশি হাঙ্গামা করা যাবে না, তাই রুটি আর দেশি মুরগির ঝোল।

আমরা বন্ধুরা প্রায় সবাই রান্না করতে জানি, তাই তিনজনেই জামা-প্যান্ট ছেড়ে ফ্রেস হয়ে রান্নার জোগাড়ে লেগে গেলাম।

অনেক দিন পর তিন প্রাণের বন্ধু একসঙ্গে হয়ে গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল। ওরা দু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করল যে আমি সত্যিই ভাগ্যবান, এই রকম রোমাঞ্চকর পরিবেশে থাকার সুযোগ সবার কপালে জোটে না।

যাই হোক, খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের জন্য বিছানা করে দিলাম, সারাদিন পাহাড়ে ঘুরে ওরাও যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছিল। ওদের শুইয়ে দিয়ে রান্নার বাসনগুলো নিয়ে আমি কুয়োতলায় বসে ধুয়ে নিলাম। কাল সকাল থেকে আবার ওদের নিয়ে ঘুরতে বেরোতে হবে, তখন আর এসব ধোয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

বাইরে সেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলছিলই, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। বৃষ্টিটা মনে হয় এবার জোরেই নামাবে।

বাসনগুলো ধুয়ে বারান্দায় মেঝের উপর উপুড় করে রাখছি এমন সময় তাতান ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওকে দেখে বললাম, "কি রে, ঘুম আসছে না— নাকি?"

তাতান চোখ টিপে বলল, "না রে, ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।" ও বলল, রাজা নাকি শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে, ও ব্যাটার কুম্ভকর্ণের

ঘুম। বলতে বলতে তাতান পকেট থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বার করল। "চলবে তো?"

"খুব চলবে, তুই না বের করলে আমিই তোকে অফার করতাম।" বলে আমি বাসনগুলো রেখে হাত-টাত মুছে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালাম। বারান্দায় সিমেন্টের বেঞ্চের উপর বসে আমরা কথা বলতে শুরু করলাম। "তারপর বল, পুণেতে তোর কী রকম কাটছে? ওখানেই কি সেটল হবি নাকি?"

"সেরকমই তো ভেবে রেখেছিলাম এতদিন। কিন্তু..." তাতান একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "তোর এই জঙ্গলবাড়ি দেখে সেই প্ল্যানটা চেঞ্জ করে ফেললাম। এবার আমিও টাকাপয়সা জমিয়ে এরকম একটা বাড়ি বানাব।"

"আরে বাড়ি বানাতে যাবি কেন!" আমি হাসতে হাসতে বললাম, "আমার এই বাড়িতেই একসঙ্গে থাকব আমরা।"

"হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। কিন্তু রাজাকে কিছুতেই এখানে রাখা যাবে না। নাহলে ও নাক ডেকে ডেকে আমাদের ঘুমের দফারফা করে ছাড়বে।" বলেই ঘরের দিকে ইশারা করে বলল, "ওই শোন, রাজার ব্যান্ডপার্টি শুরু হয়ে গেছে।" তাতানের কথা শুনে আমি 'হা হা' করে হেসে উঠলাম।

আমাদের কথার মধ্যেই বৃষ্টিটা এতক্ষণে একটু জোরে শুরু হলো, বারান্দার জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছিল বলে ওটা বন্ধ করে দিলাম।

রাজা ঘুমের মধ্যে খুব নাক ডাকে, ওর নাকের ঘড়ঘড়ানি আমরা বারান্দা থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি মজা করে তাতানকে বললাম, "পাশে শুয়ে কেউ ওরকম করে নাক ডাকলে ঘুমের দফারফা তো হবেই রে ভাই।"

তাতান হেসে উঠল, "যা বলেছিস।"

ওর নাক ডাকা নিয়ে কিছু মজার স্মৃতি ছিল, সেগুলো নিয়ে আমরা হাসাহাসি করছিলাম। এমন সময় রাজার নাকের ঘড়ঘড়ানি থেমে গেল। ভাবলাম আমাদের হাসি শুনে হয়তো ওর ঘুম ভেঙে গেছে।

পাছে রাজা শুনতে পায় তাই আমরা হাসি থামিয়ে একে অপরকে চুপ করাতে গিয়ে আবার বেশি করে হেসে উঠলাম।

ঠিক তখনই ঘরের ভিতর থেকে রাজার আর্তনাদ ভেসে এলো!

৩

উফফ! সেই কান ফাটানো চিৎকার আজও আমার কানে বাজে। যেন ভীষণ আতঙ্কে কেউ গলার শেষ জোরটুকুকে একত্রিত করে চিৎকার করে উঠল।

আমরা চমকে উঠে কী হয়েছে দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই রাজা যেন ছিটকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। ওর অবস্থা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ে ওর মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে! চোখ দুটো বিস্ফারিত! যেন এখুনি বাইরে বেরিয়ে পড়বে।

"এই রাজা, কী হয়েছে তোর?"

কিন্তু রাজা আমাদের যেন দেখতেই পেল না। কোনও অজানা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে চিৎকার করতে করতে বারান্দার দরজা খুলে সদর ফটকের দিকে ছুটে চলে গেল।

আমরা কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সম্বিত ফিরে পেয়েই আমরাও ছুটলাম ওর পিছনে।

কী হলো ওর! হঠাৎ করে অমন ভয় পেয়ে গেলে কেন?

"রাজা, কী হলো রে? দাঁড়া দাঁড়া, কী হয়েছে বল।" আমরা অনেক ডাকলাম পিছন থেকে, কিন্তু আমাদের ডাক ওর কানেই পৌঁছল না। ও পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

নিছক মজা করার জন্য যে রাজা এটা করেনি তা আমরা [illegible] বুঝতে পারছিলাম। তাছাড়া এই জঙ্গলে ও কিছুই চেনে না। এলোপাথাড়ি ছুটতে গিয়ে কোথায় কোন বিপদে পড়বে তার ঠিক কী। আমরা ওর পিছনেই ছুটতে ছুটতে ফটকের বাইরে

বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায় রাজা! ও ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বৃষ্টিটা এতক্ষণে বেশ জোরেই পড়তে শুরু করেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু দূর থেকে রাজার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। ওর চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে আমরাও ওর পিছনে ছুটতে শুরু করলাম।

ও যেভাবে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটছে, এই পাথুরে পথে কোথাও হোঁচট খেয়ে পড়লে মারাত্মক বিপদ ঘটে যাবে।

আমরা ছুটতে ছুটতেই চিৎকার করে ওকে ডাকছি কিন্তু ও যেন আমাদের ডাক শুনতেই পাচ্ছে না।

বৃষ্টির জন্য একটু একটু কাদা হয়ে গেছে রাস্তায়, পা স্লিপ করলেই ধড়াম করে আছড়ে পড়তে হবে পাথুরে রাস্তার উপর। এদিকে রাজা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দূর থেকে ওর তারস্বরে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সামনে আর কিছুটা গেলেই সেই পরিত্যক্ত পাথরের খাদানটা পড়বে। কি সর্বনাশ! ওখানে যে খাদানের বিরাট বিরাট গভীর গর্তগুলো সাক্ষাৎ মৃত্যুদুত হয়ে অপেক্ষা করছে। কোনও ভাবে সেই গর্তে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। রাজা যে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওদিকেই ছুটতে শুরু করেছে! কথাটা মনে হতেই আতঙ্কে আমার সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম, "রাজা, দাঁড়া দাঁড়া, সামনে খাদ!"

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমার সে ডাক বোধহয় ওর কানে পৌঁছল না।

সামনে অনেক দূর থেকে আবার ওর সেই মর্মভেদী আর্তনাদ ভেসে এলো। এবং ঠিক তখনই সামনের পুরো আকাশটা জুড়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। খাদানের কাছে একটা বিশাল মহুয়া গাছ আছে, বিদ্যুতের সেই ক্ষণিক আলোয় দেখলাম, রাজা মহুয়া গাছটার ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আমরা পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করলাম, যেভাবেই হোক

ওকে ধরতেই হবে। নাহলে আবার যদি ও ছুটতে শুরু করে তাহলে নির্ঘাত খাদানের গর্তে পড়ে বেঘোরে মারা যাবে।

খাদানের এদিকটায় জঙ্গল কিছুটা কম। এদিক ওদিক কয়েকটা শাল মহুয়ার গাছ ফাঁকা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুতের আলো এক একবার চারিদিক আলোকিত করে দিচ্ছে এবং মুহূর্তের মধ্যে আবার সব ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

মহুয়া গাছটার নীচে পৌঁছে দেখি রাজা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আমরা ওর পিছনের দিকে ছিলাম, ওকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে তাতান ছুটে গিয়ে পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল। "অ্যাই রাজা, এসব কী পাগলামি শুরু করেছিস তুই! কী হয়েছে তোর?"

কিন্তু একি!

তাতান রাজাকে ধরতেই ও হিংস্র জন্তুর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে 'আঁ- আঁ- আঁ' করে গর্জন করে উঠল। তারপর দু'হাতে তাতানকে পুতুলের মতো মাটি থেকে শূন্যে তুলে 'ধড়াম' করে আছড়ে দিলো। চোখের সামনে দেখলাম তাতানের ভারি শরীরটা মাটিতে পড়ে খাদানের ঢাল বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এসব কী হচ্ছে! রাজা কি পাগল হয়ে গেল নাকি!

ওদিকে তাতান উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। নিশ্চয়ই এই পাথর উঁচিয়ে থাকা মাটিতে পড়ে ওর ভয়ানক চোট লেগে গেছে।

ওই অবস্থাতেই দেখলাম রাজা আকাশের দিকে মুখ তুলে ভীষণ আক্রোশে গর্জন করে উঠল। তারপর পাশেই পড়ে থাকা একটা বড় পাথর অবলীলায় দু'হাতে মাথার উপরে তুলে নিয়ে তাতানের দিকে এগোতে লাগল। তাতান তখন মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ও জানেই না কি ভয়ংকর বিপদ এগিয়ে আসছে ওর দিকে! আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। রাজা যখন তাতানের কাছে পৌঁছে ওর

মাথা লক্ষ্য করে পাথরটা তুলল তখন হঠাৎ যেন ভিতর থেকে কেউ নাড়িয়ে দিলো আমাকে। ছুটে গিয়ে দু'হাতের সমস্ত জোর একত্র করে রাজাকে ধাক্কা দিলাম। সেই ভয়ংকর ধাক্কার চোটে দু'জনেই ছিটকে পড়লাম মাটিতে। রাজা খাদানের রাস্তার ঢালে পড়ে ঘষটে গেল। ওর হাতের পাথরটা ছিটকে খাদানের ওদিকে একটা পাথরের উপর পড়ে একরাশ আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিলো। তারপর কর্কশ আওয়াজ তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল খাদানের গর্তে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম রাজা মাটিতে পড়ে একদম স্থির হয়ে গেছে। ও আর ওঠার চেষ্টা করল না দেখে ছুটে তাতানের কাছে গেলাম। বেচারা ভীষণ চোট পেয়েছে। মাটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের উপর পড়েছে বলে সারা শরীর ভয়ানক ছেঁচে গেছে। কী জানি আরও কিছু হয়েছে কিনা, এই নিকষ অন্ধকারে কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। কোনও রকমে তাতানকে ধরে তুললাম। ও যন্ত্রণায় স্থান-কাল ভুলে রাজাকে অশ্রাব্য খিস্তি দিতে শুরু করল।

যাক বাবা, তার মানে ও ঠিকই আছে। চোট হয়তো তেমন গুরুতর নয়। ধরাধরি করে তাতানকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে আমি রাজার কাছে গেলাম।

ও তেমনই উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। বৃষ্টির জল ওর চোখে-মুখে লাগছে তবু ওর কোনও সাড় নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে হয়।

রাজার চেহারাটা বিরাট, ছোটখাটো দানব একটা। আমার একার পক্ষে ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাতানের যা অবস্থা তাতে ওরও আমাকে সাহায্য করার মতো শক্তি নেই। রাজার বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টেনে হিঁচড়ে ওকে ঢালের দিক থেকে উপরে নিয়ে এলাম। একটা বড় পাথরে ঠেস দিয়ে ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও ওর পাশে 'ধপ' করে বসে পড়ে হাঁফাতে লাগলাম। তাতান পাশেই সেই পাথরটার উপরে বসে কোঁকাতে কোঁকাতে খিস্তি দিয়ে রাজার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাচ্ছিল।

এদিকে বৃষ্টিরও থামার কোনও নাম নেই, ওই অঝোর বৃষ্টির মধ্যেও রাজা অজ্ঞান হয়ে আছে কী করে সেটাই বুঝতে পারছি না।

৪

বুঝতে অবশ্য কোনওটাই পারছি না। কী থেকে যে কী হলো– কিছুই মাথায় ঢুকছে না। হঠাৎ করে এমন কী হলো যে রাজার মতো দুর্ধর্ষ ছেলেও ভয় পেয়ে গেল!

আমি আর তাতান তো বারান্দাতেই বসেছিলাম, আমরা কিছু টেরই পেলাম না আর রাজা এতটা ভয় পেয়ে গেল! ভয় নাহয় পেল কিন্তু এতদূর ছুটে এলো কেন? আর তাতানকে ওভাবে তুলে ছুঁড়ে দিলোই বা কেন? আমি ঠিক সময়ে না আটকালে পাথর দিয়ে থেঁতলে আজ মেরেই ফেলত তাতানকে। রাজাকে আমি ছোট থেকে চিনি, যেমন অসুরের মতো চেহারা তেমনি আসুরিক ক্ষমতা ওর। একসঙ্গে কত জায়গা ঘুরেছি ট্রাক চালিয়ে। বদরাগি না হলেও ও খুব গোঁয়ার, আর একবার খেপে গেলে ওর সামনে দাঁড়ানো বিপজ্জনক। তবে ছোট থেকেই কোনও অজ্ঞাত কারণে ও আমাকে খুব মানতো। আমার কথা শুনত, কিন্তু আজ ও আমাকেও গ্রাহ্য করল না। কি মারাত্মক বিপদটাই না ঘটাতে যাচ্ছিল আজ! এমন সাংঘাতিক ভয় ও পেল কীসে? কী এমন হলো যে আমাদের প্রাণের বন্ধু তাতানকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল।

নাহ, এখানে এভাবে বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকা যাবে না। জামা-প্যান্ট তো অনেক আগেই ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। আসার সময় ওই পরিস্থিতিতে টর্চ বা মোবাইল কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি। এই অন্ধকারে এখানে বসে থাকলে হাতি বা হায়েনার পালের সামনে পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর আমরা তিনজনেই অল্পবিস্তর জখম হয়ে আছি। হায়েনা এসে পড়লে তিনজনকেই ছিঁড়ে খাবে। নিরুপায় হয়ে তাতানকে বললাম, "চল তাতান, রাজাকে দু'জনে মিলে কাঁধে তুলে জঙ্গলবাড়িতে ফেরার

চেষ্টা করি।"

আমার কথা শুনে ও ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, "খেপেছিস নাকি! ওই ঘটোৎকচকে আমি বইব?"

তাতানের দুটো হাতেই নাকি অসহ্য ব্যথা। ছড়ে গিয়ে রক্তও বেরোচ্ছে। দেখলাম ওর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়।

উপায়ান্তর না দেখে বললাম, "তাহলে তুই রাজার কাছে বোস, আমি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসছি।"

"না- আ- আ- আ," তাতান আর্তনাদ করে উঠল। "এই অন্ধকারে ওই রাক্ষসটার সঙ্গে আমি কিছুতেই থাকব না।"

স্বাভাবিক, একটু আগেই যা ঘটে গেছে তাতে রাজার কাছে একা থাকাটাও ভয়ের।

বললাম, "তাহলে তুই যা, গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ রাজাকে পাহারা দিচ্ছি।"

বলেই বুঝলাম এটাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর যা অবস্থা তাতে এতটা রাস্তা ওর পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব নয়। আর রাস্তা ভুল করে জঙ্গলে ঢুকে পড়লে আবার কোন বিপদে পড়বে কে বলতে পারে। তাতান স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, যে বাড়িতে রাজার মতো সাহসী ছেলে ভয় পেয়েছে সেই বাড়িতে একা যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। গেলে আমরা দু'জনেই যাব, আর নাহলে সকাল পর্যন্ত এখানেই বসে থাকব। বড় অদ্ভুত দোটানায় পড়া গেল! এখানে বসে থাকলেও বিপদ আবার যদি দু'জনে গাড়ি আনতে ফিরে যাই তাহলে এই পাথর খাদানে রাজা একা পড়ে থাকবে। যদি আবার উঠে পালায় তাহলেও বিপদ আর যদি হায়েনার দল ওর খোঁজ পায়, তাহলে গাড়ি নিয়ে আমরা ফেরার আগেই ওরা রাজাকে খেয়ে সাফ করে দেবে।

দুশ্চিন্তার কারণে মাথায় কোনও বুদ্ধিও আসছে না। গোটা কয়েক বড় বড় পাথর কুড়িয়ে সামনে জড়ো করে রাখলাম। যদি হায়েনা আসে তো ওগুলো ছুঁড়ে ভয় দেখাতে পারব।

ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে সময় যেন কাটতেই চায় না, প্রতিটা মিনিট যেন ঘণ্টার মতো মনে হচ্ছে। কতক্ষণ কেটেছে

জানি না, বৃষ্টিটা একটু ধরেছে ততক্ষণে। আমরা তিনজনেই একভাবে ওই পাথর খাদানের কাছে বসে আছি। তাতান এতক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে নিজেকে।

ওকে বললাম, "বৃষ্টি তো ছেড়ে গেছে, চল এবার কোনও রকমে ফেরার চেষ্টা করি। এভাবে এখানে আর কতক্ষণ বসে থাকব!"

তাতান বসে বসে কিছু একটা ভাবছিল। আমার কথায় চমকে ফিরে তাকাল। বলল, "সত্যি করে বল তো বিক্রম, তোর ওই বাড়িতে কী আছে?"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী থাকবে? কিছুই নেই।"

ও আমার কথা বিশ্বাস করল না। মাথা নেড়ে বলল, "হতেই পারে না, কিছু তো নিশ্চয়ই আছে ওই বাড়িতে। নাহলে রাজার মতো ছেলে ভয় পেল কেন?"

ওর প্রশ্নের কোনও উত্তর আমার কাছে ছিল না। ওরা এই বাড়ির ভুতুড়ে ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফালতু ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি বলেই আমি ইচ্ছে করে ওদের সেসব কথা বলিনি। আর এখন যদি বলি তাহলে তাতান তো আর ফিরতেই চাইবে না। কিন্তু এখন ফিরে না গেলেই নয়।

হঠাৎ রাজা নড়ে উঠল, ওর জ্ঞান ফিরে আসছে মনে হয়। তাড়াতাড়ি উঠে ওর কাছে গিয়ে ওর কাঁধ দুটো ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলাম, "রাজা, এই রাজা? ওঠ ওঠ।"

তাতান দেখি ভয় পেয়ে একটা বড় পাথর তুলে নিলো, রাজা বেগড়বাই করলেই ও সেটা ছুঁড়ে মারবে।

রাজা সোজা হয়ে উঠে বসল, তারপর সামনে আমাকে দেখতে পেয়ে খপ করে আমার হাত দুটো চেপে ধরে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। জ্ঞান ফিরে পেতেই ওর সেই ভয়টা আবার ফিরে এসেছে।

ওকে ধরে কোনও মতে পাথরটার উপরে বসিয়ে বললাম, "এখন কেমন লাগছে তোর? হেঁটে ফিরতে পারবি?"

ফেরার কথা শুনেই রাজা আর্তনাদ করে উঠল। ও কিছুতেই

আর ওই বাড়িতে ফিরতে চায় না।

তাতান এতক্ষণে রাজাকে স্বাভাবিক দেখে ভীষণ খেপে উঠে বলল, "বিক্রম, ওই শালার পিছনে লাথি মেরে খাদে ফেলে দে। তখন থেকে কি নাটকটাই না করছে! মার শালাকে দুই লাথ।"

অন্য সময় হলে দু'জনে ঝগড়া লেগে যেত, কিন্তু দুর্বলতার জন্যই হোক বা অন্য কারণে রাজা কোনও উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু তাতান ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়, ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে রাজাকে গালিগালাজ করতে শুরু করল।

"তাতান, এবার শান্ত হ তুই। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন ওকে গালাগালি করেও কোনও লাভ নেই। এইখানে এই বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তার থেকে চল জঙ্গলবাড়িতে ফিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিবি।"

রাজা আর তাতান একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল, "না-আ- আ- আ!"

রাজা ডুকরে উঠে বলল, "আমি আর ওই বাড়িতে ফিরে যাব না।"

তাতানও আতঙ্কিত হয়ে বলল, "রাতটা এখানেই বসে কাটিয়ে দেবো বিক্রম, কিন্তু ওই বাড়িতে আমি আর পা দিচ্ছি না।"

অনেক কষ্টে ওদের বুঝিয়ে শান্ত করে জঙ্গলবাড়িতে ফেরার জন্য রাজি করালাম। ওরা জানেই না, এই জঙ্গলে ওই বাড়িটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা। এই ফাঁকা মাঠে ভূতের থেকেও বড় বিপদ এসে উপস্থিত হতে পারে। হাতি বা হায়েনার পাল ভূতের থেকে অনেক বেশি ভয়ংকর। আমার কথা শুনে ওরা শেষমেশ রাজি হয়ে গেল। আমি রাজাকে ধরে ধরে হাঁটতে শুরু করলাম, তাতান সারাটা রাস্তা দু'হাতে দুটো পাথর নিয়ে আমাদের পিছন পিছন হেঁটে এলো। বুঝলাম, ওর রাজার প্রতি ভয়টা এখনও কাটেনি।

৫

রাজা বা তাতান— দু'জনে কোনও মতেই বাড়ির ভিতরে ঢুকবে না, অনেক বুঝিয়ে ওদের বারান্দায় বসালাম। একটু ধাতস্থ হয়ে রাজা যা বলল তাতে আমারও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সারা দিনের ক্লান্তির জন্য রাজা শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড অস্বস্তি হওয়ায় ওর ঘুমটা ভেঙে যায়। দেখে একজন ভয়ংকর চেহারার লোক ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। সে নাকি এত ভয়ংকর দেখতে ছিল যে তার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সারা শরীর বড় বড় লোমে ঢাকা, মুখের চামড়া মাংস গলে গিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে, চোখের মণি দুটো সাদা। লোকটা ধীরে ধীরে তার কালো লোমশ হাত দুটো দিয়ে রাজাকে জড়িয়ে ধরছিল। একটা পচা দুর্গন্ধ আসছিল লোকটার সারা শরীর থেকে। ঘুম ভাঙতেই রাজা ওকে দেখে ভয়ে আঁতকে ওঠে, আর লোকটা ওকে জাগতে দেখেই তার বড় বড় তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত দিয়ে ওর বুকের কাছটাতে কামড় বসিয়ে দেয়!

ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে রাজা লোকটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়, তারপর ছুটে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের নাকি কোথাও দেখতে পায়নি, তাই ভয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে ও চিৎকার করে আমাদের ডাকছিল কিন্তু আমরা নাকি সাড়া দিইনি। ও ভেবেছিল আমরা ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছি। ও ছুটে পালাতে গিয়ে পাথর খাদানের কাছে পৌঁছয় এবং বিদ্যুতের আলোতে দেখে ওই ভয়ংকর লোকটা ওখানেও দাঁড়িয়ে আছে, সেই দেখে ও ভয়ে চিৎকার করে ওখানেই পড়ে যায়। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

রাজা তার জামা সরিয়ে আমাদের সেই কামড়ের দাগ দেখাল। দেখি সত্যিই ওর বুকে দুটো ছোট সাইজের ফুটো, তাতে তখনও অল্প অল্প রক্ত ফুটে উঠছে।

তাতান ভেজা দেশলাই দিয়ে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা

করছিল, রাজার কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে কী একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু প্রথমটা কথা খুঁজে পেল না। তারপর রাগে একেবারে ফেটে পড়ল।

"আমরা তোকে ছেড়ে পালিয়েছিলাম! শালা জোচ্চোর। তোর জন্য সারা রাত আমরা হয়রান হলাম, আর তুই তো আমাকে মেরেই ফেলছিলি আরেকটু হলে।"

তাতান খেপে গেছে দেখে আমিই আবার বুঝিয়ে ওকে শান্ত করলাম। এটা মাথা গরম করার সময় নয়। ব্যাপারটা কী হলো সেটা আলোচনা না করলে বোঝার উপায় নেই।

রাজাকে সব খুলে বলতে ও আমাদের কথা মানতেই চাইল না। ওর ধারণা আমরা ওকে একা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তাতান ওর হাত এবং পায়ের চোটগুলো দেখাতে রাজা লজ্জিত হলো, মাথা নেড়ে বলল, ওর সত্যিই কিছু মনে নেই।

সারা রাত আমরা তিনজনে বাইরে বারান্দাতে বসেই কাটালাম। ওরা কিছুতেই ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইল না। সিগারেট খেয়ে আর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য নানা যুক্তি দিয়ে আজকের ঘটনাটা বিশ্লেষণ করেই রাত কেটে গেল। আমি গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ওদের ব্যাগ খুলে জামা-প্যান্ট বার করে এনে দিলাম। নাহলে ওরা ওই ছেঁড়া কাপড়েই রাত কাটিয়ে দেবে বলছিল। রাজার বুকের ওই দাঁতের ক্ষত দুটোতে বোরোলিন লাগিয়ে দিলাম। তাতানের কনুই এবং হাঁটুতেও বোরোলিন লাগিয়ে দিলাম। এছাড়া এখানে আর কী-ই বা উপায় আছে। কাল সকালে ঝালদাতে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নিতে হবে। তাতান এবং রাজা দু'জনেই ওই ঘরটাকে ভীষণ ভয় পাচ্ছে দেখলাম। এবং এতদিন এই বাড়িতে একা কাটানোর পর আজ প্রথম ঘরে ঢুকতে গিয়ে আমারও গা-টা কেমন যেন ছমছম করে উঠল।

সকাল থেকে ধুম জ্বরে রাজা একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে নিজের মনেই কীসব বলছে তার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। আমরা ধরাধরি করে ওকে গাড়িতে তুলে সোজা ঝালদায় নিয়ে গেলাম। ঝালদা গিয়ে প্রথমেই ওদের ডাক্তার দেখালাম।

রাজাকে নিয়েই আমার চিন্তাটা বেশি হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু অবশ্য রাজাকে পরীক্ষা করে বললেন চিন্তার তেমন কোনও কারণ নেই, তবে বেশ কিছুদিন টানা বিশ্রাম নিতে হবে। অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। তার উপর শরীরের চোট আঘাতের জন্য ব্যথা টাটিয়ে উঠেছে বলে জ্বরটা বেশ ভালোই ভোগাবে। নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে এখন কিছুদিন।

তাতানের চোট তেমন গুরুতর নয়, তবে ছেঁচে যাওয়ার দরুণ ব্যথাটা নাকি কিছুদিন থাকবে। দু'জনকেই ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। ওদের আর এখানে রাখা যাবে না। এই অবস্থায় আর ঘোরাঘুরিও সম্ভব নয়। ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে আমার গ্যারেজে নিয়ে গেলাম ওদের। সামান্য কিছু জলখাবার আর ওষুধ খেয়ে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নেওয়ার পর রাজার জ্বরটা একটু কমল। এখন কোনও বাস নেই, তাই গ্যারেজেরই একটা গাড়ি করে ওদের গ্রামে ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করলাম। ড্রাইভারকে বলে দিলাম, একেবারে গ্রামে গিয়ে ওদের নামিয়ে দিয়ে আসবে। তাতানের রাগ এতটুকু কমেনি, ও রাজার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতেই গাড়িতে উঠল। দেখে খুব মজা পেলাম, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। এইভাবেই আমরা কথায় কথায় ঝগড়া করতাম। ওদের বিদায় জানিয়ে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওরা ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে গেলেই আমার শান্তি। আমার এখানে এসে ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে সারা জীবনের জন্য কলঙ্ক লেগে যেত। ওরা গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা দিতেই আমি গ্যারেজের কাজে লেগে পড়লাম। এতক্ষণে সব কিছুই বড় স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, কাল রাত্রে যেন কিছুই ঘটেনি।

দুপুরের পর গ্যারেজ থেকে ফেরার পথে কী মনে করে বাড়ি-মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঝালদা সংলগ্ন কালীপুর গ্রামে বাড়ি-মালিক দ্বিজেন মাহাতর বাড়ি। কালকের ঘটনাটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না। ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিজেন মাহাতর সঙ্গে কথা না বললেই নয়। কিছু তো রহস্য আছেই ওই

বাড়িটায়। ওঁর সঙ্গে কথা বলে সেই রহস্যের কথাটাই আমাকে জানতে হবে। যদি সত্যিই কোনও রহস্য থেকে থাকে তাহলে সেটা উনি আমাকে আগে জানাননি কেন— সেকথাও জিজ্ঞাসা করব। ঈশ্বরের কৃপায় কাল রাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু ঘটতেও তো পারত।

দ্বিজেন মাহাত বাড়িতেই ছিলেন, বয়েস হয়েছে তাই বাইরে খুব একটা বেরোন না। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন বলে মনে হলো না। মৌখিক আপ্যায়ন করলেন অবশ্য, আমার ব্যবসা কেমন চলছে খোঁজ নিলেন। কিন্তু ওই বাড়িটার বিষয়ে কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না। এটা সেটা নানা কথার পর আমি গত রাত্রের ঘটনাটা খুলে বললাম। সব শুনে উনি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কপাল চাপড়ে বললেন, "সব আমারই দোষ, আমার পাপেই এসব শুরু হয়েছে।" বলতে বলতে উনি কেঁদে ফেললেন।

আমি চুপ করে শুনছিলাম, ওঁর কান্না দেখে ভাবলাম হয়তো এইবার রহস্য ভেদ হবে।

একটু সামলে নিয়ে উনি যা শোনালেন তাতে আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম।

যৌবন কালে দ্বিজেন মাহাত এক আদিবাসী গুণিনের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই আদিবাসী গুণিনটি ছিল বিশাইসিদ্ধ। বিশাই বিদ্যায় পারদর্শী সেই গুণিন নাকি অসাধ্য সাধনে সক্ষম ছিল। জঙ্গলের মধ্যে আজকে যেখানে ওই বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই ছিল সেই গুণিনের সাধনপীঠ। একদিন কোনও কারণে গুণিনের সাধনকর্মে অঙ্গহানি ঘটে এবং বিশাই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশাই সাধনার নিয়ম হলো যে যতদিন সাধক বিশাইকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে ততদিন বিশাই তার দাসত্ব স্বীকার করে তার কথামতো কাজ করবে। কিন্তু কোনও ভাবে সাধক যদি বিশাইয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখন বিশাই সাধকের কাছে প্রতি অমাবস্যার রাতে মানুষের রক্ত চায়। দিতে না পারলে সাধককে নিজের বুক চিরে রক্ত দিতে হয়। নাহলে বিশাই সাধকেরই হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে তাকে মেরে ফেলে

আরেকটি বিশাইয়ে রূপান্তরিত করে। সেই আদিবাসী গুণিনটিরও একই হাল হয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে তার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা প্রথম খুঁজে পান এই দ্বিজেন মাহাত। তারপর শক্তিসাধনার লোভে ওই মৃত শরীরটি সাধনপীঠে এনে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করে বিশাইয়ের শক্তিকে ফের জাগ্রত করে তোলেন। ধীরে ধীরে গুণিন হিসেবে এই এলাকায় দ্বিজেন মাহাতর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিশাইয়ের অপরিসীম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উনি মানুষের নানান সমস্যা দূর করতেন, ফলে মান-সম্মানের সঙ্গে মোটা টাকা আমদানি হতে শুরু করল। কিন্তু কথাতেই আছে, সাপ কখনও পোষ মানে না। বিশাইয়ের শক্তিকে বশীভূত করে তাকে দিয়ে কাজ করালেও, বিশাই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। একদিন দ্বিজেন মাহাত অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মহুয়ার নেশার ঝোঁকে বিশাইকে টাটকা মুরগির রক্ত ভোগ দিয়ে ফেলেন। এবং তারপরেই বিশাই শক্তিশালী হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারপর থেকে প্রতি অমাবস্যায় বিশাইকে মানুষের টাটকা রক্ত দিয়ে তুষ্ট রাখতে হতো। প্রথম প্রথম এদিক ওদিক থেকে মানুষের রক্ত জোগাড় হলেও পরে দ্বিজেন মাহাত নিজের রক্ত দিতে বাধ্য হন। বেশ কয়েক বছর ওভাবেই চলেছিল, কিন্তু পাথর খাদান শুরু হবার পর আর ওখানে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তখনই বিশাইয়ের অত্যাচার শুরু হয়। ওই পাথর খাদানের তিনজন কর্মচারি বিশাইয়ের হাতে খুন হয়। তারপর সব চুপচাপ হয়ে যায়। দ্বিজেন মাহাত ভেবেছিলেন যে বিশাই হয়তো ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। তারপর উনিও আর কখনও বিশাইয়ের থানে ফিরে যাননি। এতগুলো বছর বাড়িটা ফাঁকাই পড়েছিল, বিশাইও আর কোনও উৎপাত করেনি। সেজন্যই উনি আমাকে বাড়িটা বিক্রিও করে দেন। ভেবেছিলেন বিশাইকে নিয়ে আর কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু উনি বুঝতে পারেননি যে বিশাই এতদিনের অতৃপ্তি আর ক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল। কালও অমাবস্যা ছিল। কোনও ভাবে বিশাই জাগ্রত হয়ে উঠে রাজাকে আক্রমণ করে তার রক্ত পিপাসা মিটিয়েছে।

সব শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু আমরা তো

বিশাইয়ের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। নিজে নিজেই বিশাই জাগ্রত হলো কী করে?"

দ্বিজেনবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "রক্তের স্পর্শে। তোমরা কাল ওই বাড়িতে মুরগি কেটেছিলে বললে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, দুটো দেশি মুরগি কাটা হয়েছিল। রাজাই তো কেটেছিল উঠোনের বড় আম গাছটার তলায় বসে।"

"আম গাছের তলায়!" দ্বিজেনবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "ওই গাছের তলাতেই তো বিশাইয়ের থান। কী সর্বনাশ করেছ তোমরা! অবশ্য তোমাদের কী দোষ। দোষ তো আমার, আমিই সবকিছু গোপন করেছিলাম।"

আমার এইবার সত্যিই ভয় করছিল, আমাদের অজ্ঞানতার জন্য বিশাই জাগ্রত হয়েছে। এইবার কী হবে কে জানে? আমিই বা এখন ওই বাড়িতে ফিরে যাব কীভাবে?

আমি জানতে চাইলাম, "আচ্ছা আমি তো ওই বাড়িতে প্রায় একমাসের ওপর আছি, এর আগেও একটা অমাবস্যা পেরিয়ে গেছে। বিশাই আমাকে আক্রমণ করল না কেন?"

আমার কথা শুনে দ্বিজেনবাবুও অবাক হলেন, "তাই তো, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তুমি কী দীক্ষিত? তন্ত্রসাধন করেছ কখনও?"

"নাহ, ওসব আমি কিছুই করিনি।"

"কিন্তু তা কী করে হয়, নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে।" বলতে বলতে দ্বিজেনবাবুর দৃষ্টি আমার গলার দিকে পড়ল, "ওটা কীসের মালা?"

মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে আমাদের গ্রামে একদল অঘোরী সাধু এসেছিলেন। তখন আমি অনেক ছোট। তখনই একজন বৃদ্ধ অঘোরী সাধু ভালোবেসে একটা রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে বলেছিলেন, সারা জীবন সেটিকে গলায় ধারণ করতে। আমি আজও সেই মালা গলায় ধারণ করে আছি।

দ্বিজেনবাবুকে সেকথা বলতেই উনি বললেন, "ওই মালা তোমার সঙ্গে থাকায় তুমি বেঁচে গেছ। কিন্তু তোমার বন্ধু বাঁচবে

না। ও বিশাইয়ের কামড় খেয়েছে, অতৃপ্ত বিশাই তার পিপাসা মেটানোর জন্য আবার ফিরবে।"

এইবার আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, রাজার কিছু হলে আমি নিজেকে কখনওই ক্ষমা করতে পারব না। বললাম, "বিশাইয়ের হাত থেকে রাজাকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির কোনও উপায় হয় না বাবা। মৃত্যু যাকে চিহ্নিত করেছে তাকে নেবেই।" একটু চুপ করে থেকে উনি আবার বললেন, "উপায় একটা আছে, তবে জানি না সফল হব কিনা। হয়তো আমারও প্রাণ সংশয় হতে পারে, কিন্তু তবুও এটা করতেই হবে। আমিই এই সব কিছুর জন্য দায়ী, এর শেষ আমাকেই করতে হবে।" কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দ্বিজেন মাহাত বললেন, "ওই মন্ত্রপূত মালা তোমার গলায় ছিল এবং তুমি তোমার বন্ধুর কাছে উপস্থিত ছিলে বলে কাল রাতে বিশাই ওর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু এখন তোমার বন্ধু এখানে নেই, বিশাই ওকে আর কোনও সুযোগ দেবে না।" বলতে বলতে উনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। "তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার বন্ধুর কাছে ফিরে যাও বাবা। তোমার কাছে মন্ত্রপূত মালা আছে। তুমি কাছে থাকলে বিশাই ওর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি গ্রামে তোমার বন্ধুর কাছে ফিরে যাও, আমি এদিকটা দেখছি।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "কিন্তু আমি থাকলে আপনার কাজে সাহায্য করতে পারতাম।"

দ্বিজেনবাবু ম্লান হেসে বললেন, "এসব কাজে সাহায্য লাগে না বাবা। যা করার একাই করতে হয়। কিন্তু তুমি আর দেরি করো না বাবা, তুমি এখুনি তোমার গ্রামে ফিরে যাও।"

৬

অগত্যা দ্বিজেনবাবুকে জঙ্গলবাড়ির চাবিটা দিয়ে ওঁকে বিদায় জানিয়ে আমি ঝালদাতে ফিরে এলাম। এখন বাঁকুড়া যাবার মতো

কোনও বাস নেই। বিকেল হয়ে গেছে, বাইকে গেলেও ঘন্টা তিনেক লাগবে। গ্যারেজের গাড়িটা তাতানদের বাঁকুড়া পৌঁছে দিয়ে একটা ভাড়ায় বেরিয়ে গেছে, সেটা এখনও ফেরেনি। আমি ঠিক করলাম গাড়ির অপেক্ষায় না থেকে বাইক নিয়েই চলে যাব। প্রায় দুশো কিমি রাস্তা, বাইকে এতটা যাওয়াও মুশকিল। কিন্তু উপায় নেই, দ্বিজেনবাবুর কাছে যা শুনলাম তাতে আর অপেক্ষা করা চলে না। যেভাবেই হোক রাত নামার আগে আমাকে রাজার কাছে পৌঁছতে হবে।

ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যেই গ্রামে পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় আসতে আসতেই তাতান ফোন করেছিল, বিকেলের পর থেকেই নাকি রাজার খিঁচুনি শুরু হয়েছে। আবার সেই রকম ভুলভাল বকছে আর কাউকেই নাকি চিনতে পারছে না। ওই ফোন পেয়ে বাকি রাস্তাটা এক রকম উড়েই এলাম বলা চলে।

আমাদের গ্রামে ঢোকার মুখে একটু জঙ্গল মতো আছে। সেখানেই একটা বেলগাছের নীচে মা বাসুলীর থান। ওখানে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছি এমন সময় মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। দেখলাম তাতান আবার ফোন করছে। ফোনটা ধরতেই ওর ভয়ার্ত গলা ভেসে এলো, "বিক্রম, তুই কোথায়? তাড়াতাড়ি আয়, রাজা বোধহয় আর বাঁচবে না!"

শুনেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আবার নতুন করে কী বিপদ ঘটল!

তাড়াতাড়ি ফোনটা কেটে ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়ে রাজাদের দরজায় যখন পৌঁছলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। লোকে লোকারণ্য চারিদিক, সবার মুখেই যেন একটা আতঙ্কের ছায়া। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই রাজার মা ছুটে এসে আমার কলার খামচে ধরে হাহাকার করে কেঁদে উঠল, "এ তোরা কী করলি রে আমার ছেলেটাকে।"

কী যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। পাড়ার কয়েক জন মহিলা রাজার মাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তাতান একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে ডুকরে উঠে এগিয়ে এলো, ওর তখন আর কথা বলার মতো অবস্থা নেই। হাত তুলে ঘরের ভিতরটা দেখিয়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

রাজার ঘরটার দরজায় গ্রামেরই কয়েকজন অতি উৎসাহী ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছে। জানি না ঘরের ভিতরে গিয়ে কী দেখব। পা দুটো কাঁপছে আমার, ওই ঘরে যাওয়ার মতো মনের জোর আমার আর নেই। কাঁপাকাঁপা পায়ে এগিয়ে গেলাম ঘরের দরজাটার দিকে।

ভিতরের দৃশ্য দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। মেঝেতে রাজার রক্তাক্ত শরীরটা পড়ে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখে-গলায়-বুকে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে। গোটা মেঝেতে শুধু রক্ত আর রক্ত। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর ডান হাতে তিনটে আঙুল নেই!

এসব কীভাবে হলো! রাজার তো শুধু জ্বর এসেছিল। সকালে যখন পুরুলিয়াতে ছিল তখন তো সব ঠিকঠাকই ছিল। বাড়ি ফিরে কীভাবে এমন হয়ে গেল!

আমি উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। আজ সকালেও যার সঙ্গে এতটা সময় কাটালাম সে এখন এই সন্ধ্যেবেলায় রক্তাক্ত লাশ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

কোনও রকমে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাজার মা বারান্দায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের অভিশাপ দিচ্ছিল। পুত্রশোকাতুর সেই মায়ের সামনে দাঁড়ানোর বা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সাহস তখন আর আমার ছিল না। কী বলব আমি এদের? রাজাকে বিশাইয়ে মেরেছে!

কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

সবাই কেমন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সবাই জেনে গেছে, রাজা কাল রাত্রে আমার ওখানেই ছিল।

হে ভগবান! এ কোন পাপের শাস্তি দিলে তুমি?

তাতানের কাছে শুনলাম, বিকেলের পর নাকি রাজা আবার

কালকের মতো অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। বাড়ির লোক ভয় পেয়ে তাতানকে খবর পাঠায়। তাতান এসে রাজার সেই রুদ্রমূর্তি দেখে আমাকে ফোন করেছিল। আমিই বলেছিলাম ওকে ঘরের বাইরে বেরোতে না দিতে। তাই সবাই মিলে ওকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিল। ডাক্তারবাবু এসেও কিছু বুঝতে পারেননি। পাগলামি মনে করে হাসপাতালে রেফার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনই হঠাৎ রাজা একটা ছুরি নিয়ে ডাক্তারবাবুকে আক্রমণ করে। সবাই মিলে কোনও রকমে রাজার হাত থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বার করে আনে। তখন রাজা নিজেই নিজের শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। নিজের গলায়-বুকে-পেটে এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে নিয়েছিল।

ওকে কোনও ভাবেই আটকানো যায়নি। ও নিজের হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল। ওর উগ্রমূর্তি দেখে ভয়ে কেউ সামনে এগিয়ে ওকে বাধা দিতেও পারেনি। অ্যামবুলেন্সে খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা আসার আগেই সব শেষ।

হে ভগবান! কেন আমি সকালে ওদের সঙ্গেই চলে এলাম না? কেন দ্বিজেন মাহাতর কাছে সকাল বেলাতেই গেলাম না? সকালেই সব জানতে পারলে রাজাকে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। ওই বদমাশ বুড়োর জন্যই এরকম হলো। ওকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

তারপর তিন চারদিন ধরে থানা পুলিশের অনেক ঝামেলা গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের থানায় বসিয়ে রেখে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু এই রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা পুলিশের ছিল না।

আমাদের যদি শাস্তি হতো তাহলেও হয়তো শান্তি পেতাম। কিন্তু সাক্ষীদের বয়ান, ডাক্তারবাবুর কলম রাজাকে পাগল সাব্যস্ত করে আত্মহত্যার কেস বানিয়ে ফাইলটা বন্ধ করে দিলো।

গ্রামের মানুষের হাজারটা প্রশ্ন আর অবিশ্বাসের দৃষ্টি আমাকে

প্রতি পদে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। হে ভগবান, শেষ পর্যন্ত এত বড় কলঙ্কের ভাগী হলাম! নিজের প্রিয় বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর দায় ঘাড়ে নিয়ে আমি বাঁচব কেমন করে?

ঘরে বাইরে চারিদিকে শুধুই সমালোচনা। সবাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটাই কথা জানতে চায়, সেদিন রাত্রে আমার ওখানে কী হয়েছিল? একরাত্রের মধ্যে একটা ছেলে এরকম ভাবে পাগল হয়ে যায় কেমন করে!

আমি সেসব প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে না পেরে বাড়ির মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে শুরু করলাম। তারপর একদিন থানা পুলিশের ঝামেলা মিটে গেল। রাজার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মও ততদিনে সম্পন্ন হয়েছে। ভাঙা মন নিয়ে আমি আবার ঝালদায় ফিরে এলাম। এবং ফিরে এসেই জানতে পারলাম আজ সাত আটদিন ধরে দ্বিজেন মাহাত নিখোঁজ!

ব্যাপারটা কী হয়েছে আন্দাজ করে আমি ভয়ে আর ওই জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যাইনি। ক'টা দিন কষ্ট করে গ্যারেজের মধ্যেই শুলাম।

এর কিছুদিন পর চাটুমঘুতুর জঙ্গলের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত পাথর খাদানের গর্ত থেকে দ্বিজেন মাহাতর পচাগলা ক্ষত বিক্ষত লাশটা খুঁজে পাওয়া যায়।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, পোষ্টমর্টেম করতে গিয়ে দেখা গেল দ্বিজেন মাহাতর হৃৎপিণ্ডটা কেউ যেন উপড়ে নিয়ে গেছে!

৭

জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন বেঁচে থাকার মধ্যেও মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয়। সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে নিজেকে মেরে ফেলে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে। রাজার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আমিও ঠিক এরকমই কিছু একটা করতে চাইছিলাম।

কিন্তু আত্মহত্যা করার মতো সাহস আমার ছিল না।

আমি বাঁচতে চাই, কিন্তু এভাবে যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকাটা মৃত্যুর থেকে কম কীসে! রাজার মৃত্যুর পর ঘরে বাইরে যেভাবে সমালোচনার মুখে পড়েছিলাম তাতে আমার বাঁচার ইচ্ছেটাই ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। গ্রামের মানুষের হাজার একটা প্রশ্ন, তাদের সন্দেহের দৃষ্টির মুখে পড়ে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কী বলব তাদের! কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? আমার নিজের বন্ধুবান্ধব এমনকী আমার পরিবার পর্যন্ত আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। তাহলে আমি কীভাবে অন্যদের বিশ্বাস করাতে পারব যে রাজার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই? আমাদের অজান্তেই আমরা এমন এক অপশক্তিকে জাগ্রত করে তুলেছিলাম, যে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোনও সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে নৃশংসভাবে আক্রমণ করে আমাদেরই প্রিয় বন্ধুকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। আমাদের অসহায়ত্বের কথা কীভাবে সবাইকে বোঝাতে পারব!

গ্রামে টিকতে না পেরে আবার ঝালদাতেই ফিরে গেলাম। ভেবেছিলাম কাজের মধ্যে থাকলে এই যন্ত্রণাগুলো ভুলে থাকতে পারব। কিন্তু ঈশ্বরের মনে হয়তো অন্য কিছু ছিল। দ্বিজেন মাহাত নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে একাই চলে গিয়েছিলেন জঙ্গলবাড়িতে। কিন্তু তিনিও শেষরক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা পাথর খাদানের মধ্যে থেকে উদ্ধার হওয়ার পর আমি পুরোপুরি ভাবে ভেঙে পড়লাম। দু' দুটো মানুষের মৃত্যুর দায় কাঁধে নিয়ে বেঁচে থাকা কতটা যন্ত্রণার, তা আমার থেকে ভালো আর কে উপলব্ধি করতে পারবে! পাথর খাদান থেকে দ্বিজেন মাহাতর লাশ উদ্ধার হবার পর আমি আবার থানা পুলিশের ঝামেলায় পড়লাম। বারবার থানায় হাজিরা দেওয়া আর জিজ্ঞাসাবাদের জ্বালায় জর্জরিত হতে হতে একটা কথাই মনে হতো যে এর থেকে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিয়ে দিলেই হয়তো আমি শান্তি পাব। কিন্তু না, ভগবান এত সহজে আমার কপালে মুক্তি লিখে রাখেননি। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে দ্বিজেন মাহাতর খুনের কেসটাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর দেখতে দেখতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। পুলিশের সঙ্গে তদন্তের স্বার্থে বেশ কয়েক বার জঙ্গলবাড়িতে যেতে হয়েছিল, কিন্তু তারপর আমি আর ওখানে ফিরে যাইনি। জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল একটু একটু করে। দ্বিজেন মাহাতর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর এলাকা জুড়ে যেরকম শোরগোল শুরু হয়েছিল, তা-ও একসময় থেমে গেল।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা তখনও নিভে যায়নি। সেই আগুনের নিরন্তর আঁচে আমি প্রতিদিন একটু একটু করে পুড়ে যাচ্ছিলাম। গ্যারেজের কাজে মন লাগাতে পারছিলাম না। জঙ্গল পাহাড়ের সৌন্দর্যের আকর্ষণও আর আমার মনকে আনন্দিত করে তুলতে পারছিল না। আমি রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না। চোখ বুজলেই জঙ্গলবাড়ির সেই অভিশপ্ত রাতের ঘটনা আমার স্বপ্নে এসে উপস্থিত হতো। রাজার সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনে চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসতাম। সারা রাত বিছানায় বসে জেগেই কাটাতে হতো। সাধুবাবার দেওয়া সেই মালার কারণে বিশাই আমাকে মারতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু যে নিদারুণ যন্ত্রণা সে আমাকে দিয়ে গেছে তার কাছে মৃত্যুও অনেক তুচ্ছ ব্যাপার।

ঝালদাতেও টিকতে না পেরে ঠিক করলাম, কোথাও পালিয়ে যাই। সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনও জায়গাতে গিয়ে কিছুদিন কাটালে হয়তো এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারব। এই ভাবনা থেকেই একদিন গ্যারেজের কর্মচারিদের উপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি আবার ট্রান্সপোর্টের লাইনে ঢুকে পড়লাম। ট্রাক বা ট্রেলার নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি জমাতে শুরু করলাম শান্তির খোঁজে। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ভাগ্যচক্রে গিয়ে পৌঁছলাম কাশীধামে। হয়তো বাবা বিশ্বনাথ নিজেই কৃপা করে আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ আমার ফিরে যাওয়ার মতো আর কোনও জায়গা ছিল না। যে মানসিক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে আমি নিজেকে যাযাবর বানিয়ে তুলেছিলাম, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই মাত্র রাস্তা খোলা ছিল। আর তা

হলো বৈরাগ্য।

কাশীধামে পৌঁছে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন করতে গিয়ে মনের মধ্যে আকস্মিকভাবে এমন সব পরিবর্তন ঘটে গেল যা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। আত্মগ্লানিতে ভুগতে ভুগতে আমি হয়তো ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম, কাশীতে পৌঁছে সেটাই যেন পূর্ণতা পেয়ে গেল। একদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে গিয়ে আমি এক অঘোরী সাধুর দর্শন পেলাম। সেই সাধুর মধ্যে কোন আকর্ষণী শক্তি ছিল আমি জানি না, কিন্তু তাঁর দর্শন পাওয়ার পর আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লাম। কোথায় গেল ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, কোথায় পড়ে রইল ট্রাক! আমি সবকিছু ফেলে সেই সাধুর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম নিরুদ্দেশের পথে।

অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। সেই অঘোরী সাধু এত সহজে আমাকে তাঁর নিজের দলে জায়গা দেননি। রীতিমতো জেদ করে আমি তাঁর দলে নিজের জন্য জায়গা করে নিয়েছিলাম। তারপর আর কী, সেই অঘোরীদের দলে ভিড়ে আমি নিজেও একজন অঘোরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম হিমালয়ের পথে। অঘোরীদের নিয়ম হলো, ওঁরা নিরন্তর পরিক্রমাবাসী। এক জায়গায় তিন রাত্তিরের বেশি কোথাও অবস্থান করেন না। ওঁদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম জায়গায় গেলাম। ততদিনে মনে মনে ওই অঘোরী সাধুকে গুরুদেবের আসনে বসিয়ে ফেলেছি। তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু শিখলাম, বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে তন্ত্রমন্ত্র, অঘোরবিদ্যা এবং ধ্যানযোগ। তারপর সেখান থেকে সমতলে নেমে এসে হাঁটতে হাঁটতে ফের এসে উপস্থিত হলাম কাশীধামে। তারপরে আবার পরিক্রমা শুরু করে গেলাম মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে। সেখানে মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করার সৌভাগ্য তো হলোই, সেই সঙ্গে আমার বহুদিনের ইচ্ছে পূর্ণ করে গুরুদেব আমাকে অঘোরপন্থায় দীক্ষিত করলেন। তারপর উজ্জয়িনী থেকে আমরা গেলাম অমরকণ্টক,

সেখানে মাতা নর্মদার উৎপত্তিস্থল। সেখানে পবিত্র নর্মদাকুণ্ডে স্নান করে জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর পরিক্রমা শুরু হলো, নর্মদা পরিক্রমা।

কীভাবে দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। যে মানসিক যন্ত্রণা, আত্মগ্লানি আমাকে যাযাবর থেকে পরিক্রমাবাসী অঘোরী সাধু বানিয়ে তুলল তা কবেই ধুনির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘর-পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ব্যবসা— কোনও কিছুই আর আমার মাথায় ছিল না। এক অলৌকিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি অঘোরব্রতের নিয়মানুযায়ী নিরন্তর পরিক্রমাকেই নিজের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়ে নর্মদা পরিক্রমা সম্পূর্ণ করলাম। কিন্তু ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার, আমার এত আনন্দ হয়তো তাঁর সহ্য হলো না। নর্মদা পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর গুরুদেব আমাকে পরিক্রমা থেকে অব্যাহতি দিলেন। বললেন, এইবার আমাকে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে হবে, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। এই সাধু জীবন আমার জন্য নয়, আমাকে সংসারে ফিরতে হবে।

গুরুদেবের কথায় সেদিন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। আমি অনেক কান্নাকাটি, অনেক অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু তিনি আমার কোনও কথা গ্রাহ্যই করলেন না।

আমি জানতাম, চিরকাল অঘোরী সাধুদের সঙ্গে পরিক্রমাবাসী হয়ে থাকতে পারব না। একদিন না একদিন আমার অতীত আমাকে পুরোনো জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই। কিন্তু আরও কয়েকটা বছর গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকতে পারলে কী এমন ক্ষতি হতো!

কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর না জানাই থেকে যায়। আজ বুঝতে পারি যে, সেই সব প্রশ্নের উত্তর জীবনের প্রবাহের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে থাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদেরই তার উত্তর খুঁজে বার করতে হয়।

যাই হোক, গুরুদেবের সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই নিদারুণ যন্ত্রণাকে মেনে নিয়ে আমি আবার বাড়িতেই ফিরে এলাম। দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর বাড়িতে ফিরে আমি বুঝতে পারলাম, কেন গুরুদেব আমাকে বাড়িতে ফেরানোর জন্য এতটা নির্দয় হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘ তিনবছর আমার কোনও খোঁজখবর না পেয়ে আমার বাড়িতে যে কোন বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা আমি গ্রামে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম। আমার বাবা-মা আমার খোঁজ না পেয়ে থানা পুলিশ পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁরা আমার কোনও খোঁজখবর পাননি। বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। সবাই ভেবেই নিয়েছিল যে রাজার মতো আমিও হয়তো কোথাও অপঘাতে মারা পড়েছি। আমি বাড়িতে ফেরার পর সবার রাগ-দুঃখ-অভিমান এবং হাজারটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে রীতিমতো বিপদে পড়ে গেলাম। কোনও রকমে সবাইকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারলেও মায়ের মুখোমুখি হয়ে আমার সব যুক্তি-বুদ্ধি হার মেনে গেল। আমি বাড়ির একমাত্র ছেলে, একটা অবিবাহিতা বোন রয়েছে বাড়িতে। আমার কাঁধে পুরো পরিবারের দায়িত্ব, আর আমি কিনা স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের সুখের জন্য বাড়িছাড়া হয়ে ছিলাম।

মায়ের প্রশ্নের জবাব আমার কাছে ছিল না।

কিন্তু মায়ের মন তো সব কিছুই বুঝতে পারে, সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়াই মায়ের স্বভাব। এতদিনের জমে থাকা অভিমান আর দুঃখের প্রবল উচ্ছ্বাসও একসময় শান্ত হলো। মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তার পায়ে হাত দিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আর কখনও আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাব না। তাদের অনুমতি না নিয়ে আর কখনও আমি কোথাও পালিয়ে যাব না, আমি বাড়িতেই থাকব এবং পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করব।

কিন্তু ঈশ্বর হয়তো সেদিন আমার কথা শুনে আবারও আড়াল থেকে হেসে উঠেছিলেন।

গুরুদেবের আদেশে আমি গ্রামে ফিরেছিলাম। তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতদিন বাবা-মা জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আমি সংসারে থেকে তাঁদের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করব। তাঁদের সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সেই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমি বাড়িতেই স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করলাম। গুরুদেবের আদেশে আমাকে গৃহী হতে হলেও আমি একজন অঘোরী। অঘোরব্রতের আদর্শের জন্য অনুকূল কর্ম ছাড়া আর অন্য কিছু আমি করতে পারব না। সেজন্য গ্যারেজ বা ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে দিতে হলো। কিছুদিন বেকার বাড়িতে বসে থাকার পর আমি বাবার সঙ্গে কাজকর্ম করতে শুরু করলাম। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেছি, পূজাপাঠ যাগযজ্ঞ এবং বেদ উপনিষদের চর্চা করা আমাদের কুলধর্ম। ছেলেবেলায় বাড়িতে থাকতে সে সবের পাঠ নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু বড় হতেই অভাবের তাড়নায় বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছিল। পৌরোহিত্য করে কোনওক্রমে দিন চলে যায়, কিন্তু তাতে পরিবারের অভাব অভিযোগ মেটে না। সেজন্যই লেখাপড়া ছেড়ে গ্যারেজে মেকানিকের কাজ শিখেছিলাম, তারপরে নিজের গ্যারেজ খুলেছিলাম ঝালদাতে। দু'হাতে পয়সাও কামিয়েছিলাম সেই সময়, কিন্তু সেসব তো কবেই ছেড়ে চলে এসেছি। অঘোরব্রতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসা বা চাকরি আমি করতেও পারব না, কিন্তু কুলধর্ম পালন করায় কোনও বাধা নেই। সেজন্য বাবার সঙ্গে পৌরোহিত্য করতে শুরু করলাম।

ছেলেবেলায় বাড়িতে যে বিদ্যায় আমার হাতেখড়ি হয়েছিল, দীর্ঘ তিনবছর গুরুদেবের সঙ্গে থেকে সেই বিদ্যায় আমি আরও সমৃদ্ধ হয়েছি। এছাড়াও গুরুদেব আমাকে তন্ত্র, আয়ুর্বেদ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমি নতুন পেশায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম। মানুষের জীবনে তো সমস্যার শেষ নেই, ফলে তান্ত্রিক এবং জ্যোতিষীদের পসার জমতেও খুব একটা দেরি হয় না। আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো। একবার নাম ছড়িয়ে পড়তেই দূরদূরান্ত থেকে কাজের ডাক পেতে

শুরু করলাম। এইভাবে আরও দুটো বছর কেটে গেল। বেশ সুখে শান্তিতেই দিন কেটে যাচ্ছিল আমাদের। ততদিনে আমার বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটে গেল সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা।

বাইক অ্যাক্সিডেন্টে গুরুতর আহত হয়ে ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে আমি বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। যেরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তাতে আমি মারাই পড়তাম, কিন্তু মৃত্যু আমাকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। হাড়গোড় ভেঙে দীর্ঘ তিনমাস বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে থাকার পর যখন সেরে উঠলাম, তখন বুঝলাম আমার আসল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা এখনও বাকি আছে।

পাঁচবছর আগের যে অতীতকে আমি ভুলতে বসেছিলাম, সেই অতীতই যেন আততায়ী হয়ে আবার আমার কাছেই ফিরে এলো।

অ্যাক্সিডেন্টে আমার ডানপায়ের পাতাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে আমি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটাচলা করতে পারছিলাম না। এমনিতে কোনও অসুবিধে ছিল না পায়ে, সাইকেল বা বাইক চালাতেও কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। শুধু হাঁটতে গেলেই খোঁড়াতে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে কেমন একটা টলমলানো ভাব। ডাক্তারের পরামর্শে রোজ সকাল বিকেল আমাকে বেশ খানিকটা হাঁটাচলা করতে হতো। লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমি গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে বেরোতাম। এমনই একদিন বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর দিকে একটু ঘুরে আসব। কিন্তু নামোপাড়ার কালীমেলার কাছে পৌঁছতেই একটা হইহট্টগোল কানে এলো। দেখলাম লোকজন সব ছুটে যাচ্ছে রাজাদের বাড়ির দিকে। আমি কী হয়েছে জানতে চাওয়ায় ছুটতে ছুটতেই কে একজন চিৎকার করে বলল, "রাজার মা গায়ে আগুন লাগিয়ে নিয়েছে।"

কথাটা শুনেই আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। রাজার ওই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তাপসী কাকিমা, মানে রাজার

মায়ের মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর আঘাতটা উনি সহ্য করতে পারেননি। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। কারও সঙ্গেই আর কথাবার্তা বলতেন না। কখনও নিজের মনেই কান্নাকাটি করতেন, আবার কখনও গুম হয়ে বসে থাকতেন। ওঁর চিকিৎসাও চলছিল, কিন্তু তাতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। আমি গ্রামে ফেরার পর নিয়মিত ওঁর খোঁজ রাখতাম, কিন্তু লজ্জায় কখনও ওঁদের বাড়ি যেতে পারিনি। ওঁর এই অবস্থার জন্য আমিই তো দায়ী, কোন মুখ নিয়ে যেতাম! তাছাড়া ভয় পেতাম, যদি আমাকে দেখে উনি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাহলে ওঁর মানসিক স্বাস্থ্যেরও হানি ঘটতে পারে। কিন্তু পুত্রশোকের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে উনি যে এরকম চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন তা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি!

খবরটা শোনার পর আর আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। সবার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আমিও পৌঁছে গেলাম রাজাদের বাড়িতে। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তাপসী কাকিমা ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে নিয়েছিলেন। দরজা ভেঙে যখন ঘরের মধ্যে ঢোকা হলো তখন উনি আমাদের সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। ভয়ংকর আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া গোটানো শরীরটা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে ইনিই তাপসী কাকিমা। ওই বীভৎস দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে কোনও রকমে টলতে টলতে বাইরে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় রাজার জেঠিমার চোখে পড়ে গেলাম। উনি এতক্ষণ বারান্দায় বসে বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়েই ওঁর শোক ভীষণ ক্রোধে পরিণত হলো। ক্রোধের আবেশে উনি আমাকে শাপ-শাপান্ত করতে শুরু করলেন।

আমিই নাকি এই সব কিছুর জন্য দায়ী। প্রথমে আমি রাজাকে মেরেছি আর আজ ওর মায়ের জীবনটাও খেয়ে নিলাম। সেই পাপেই নাকি আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওই অ্যাক্সিডেন্টে

আমি মরে গেলাম না কেন— ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ওঁকে কোনও দোষ দিই না। নিষ্ঠুর পরিস্থিতির কারণেই উনি এসব কথা বলছিলেন। কিন্তু আজ পাঁচবছর ধরে যে যন্ত্রণার কথা আমি ভুলে ছিলাম, ওঁর কথার খোঁচায় সেই যন্ত্রণা আবার যেন দ্বিগুণ হয়ে আমার কাছে ফিরে এলো।

সত্যিই তো, এই সব কিছুর জন্য আমিই তো দায়ী। আমি জঙ্গলবাড়িতে নিয়ে না গেলে রাজাকে কখনওই ওভাবে মরতে হতো না। আজ তাপসী কাকিমার এরকম মর্মান্তিক পরিণতির কারণও তো সেই আমিই। রাজার মৃত্যুর ওই ভয়ংকর দুঃখ এবং আত্মগ্লানির আগুন থেকে বাঁচতে আমি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অপরিচিত নতুন পরিবেশে গিয়ে আমি ধীরে ধীরে সেই সব কিছু ভুলতেও পেরেছিলাম। কিন্তু তাপসী কাকিমার তো সেরকম কোনও সুযোগ ছিল না। যে বাড়িতে চোখের সামনে নিজের ছেলের বীভৎস মৃত্যু দেখেছেন, সেই ভয়ংকর স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতেই উনি দিনের পর দিন থাকতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের মনেই গুমরে গুমরে কেঁদেছেন। নিজের অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা উনি কাউকেই বলতে পারেননি। ওঁর পালিয়ে যাওয়ার মতো কোনও জায়গাই ছিল না। অবশ্য এরকম কোনও জায়গা এই দুনিয়াতে নেই যেখানে গেলে একজন মা তার পুত্রশোক ভুলে যেতে পারে। যে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে উনি এতগুলো দিন কাটিয়েছেন, সেই যন্ত্রণার কথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেদিন বাড়িতে ফেরার পর আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অ্যাক্সিডেন্টে যে শারীরিক আঘাত পেয়েছিলাম তা নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। ভাঙা হাড়ের যন্ত্রণা সহ্য করে আমি দিব্যি সেরে উঠেছিলাম, কিন্তু রাজার জেঠিমার ওই নিষ্ঠুর কথার আঘাত আমাকে আবার শয্যাশায়ী করে ফেলল। দু' দুটো মৃত্যুর দায় ঘাড়ে নিয়ে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম, আরও একটা মৃত্যুর দায় বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যাই হোক, এরপর বেশ কিছুদিন ভোগার পর আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠলাম। শরীরটা সেরে উঠল ঠিকই কিন্তু মনের অবস্থার কোনও উন্নতি হলো না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, খেতে ইচ্ছে করে না। রাত্রে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসি, আর সারা রাত ঘুমোতে পারি না। সময়ের কি অদ্ভুত খেলা! পাঁচবছর আগে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, আবার যেন সেই পরিস্থিতিই ফিরে এলো নতুন ভাবে। সেদিন পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল আমার কাছে, আজ আর তা নেই। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাকে একলাই করতে হবে, কিন্তু কীভাবে?

মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর আমি কখনও কোথাও পালিয়ে যাব না। কিন্তু এখানে থাকলে তো আমি পাগলই হয়ে যাব! দিনের পর দিন রাত্রে ঘুমোতে না পেরে আত্মহত্যা করার চিন্তাও মাথায় আসতে শুরু করেছিল। আমার ওই পাগলের মতো অবস্থা দেখে বাবা-মা-ও খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

একদিন রাত্রে খাওয়ার সময় বাবা আমাকে বলল, "এভাবে মনমরা হয়ে না থেকে ক'টা দিন কোথাও একটা ঘুরে আয় না। বাড়িতে থাকলেই ওই সব আজেবাজে চিন্তা মাথায় আসবে। তার থেকে কিছুদিন কোথাও ঘুরে ফিরে আয়, দেখবি মনটা ভালো হয়ে যাবে।"

মা-ও দেখি বাবার কথায় সম্মতি দিলো। বুঝলাম ওরা আগেই এই ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাহলে এই অবস্থায় মা কিছুতেই আমাকে বাইরে যেতে দিতে চাইত না। ওরা খারাপ কিছু বলেনি, কিন্তু কোথায় যাব? অ্যাক্সিডেন্টের পর শরীরের যা অবস্থা হয়েছে তাতে খুব বেশি দূরে কোথাও যেতেও পারব না। নাহলে আবার হিমালয়েই পালিয়ে যেতাম। পাহাড় জঙ্গলে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে থাকলে হয়তো মনটাকে শান্ত করতে পারব। কিন্তু এই ভাঙাচোরা শরীরে তা আর সম্ভব নয়।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম, পুরুলিয়ায় আমার সেই জঙ্গলবাড়িতেই ফিরে যাব। বাড়িটা আজ পাঁচবছর ধরে তালাবন্ধ

হয়ে পড়ে আছে, ওখানে গিয়েই দিব্যি থাকা যাবে। প্রকৃতির মধ্যে একলা নির্জনে দিব্যি থাকতে পারব। ওখানে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। আর একটা পুরোনো বোঝাপড়াও বাকি আছে ওই বাড়িটার সঙ্গে, সেটাও এইবার মিটিয়ে ফেলা দরকার। ওই বাড়িতেই বিশাইয়ের আক্রমণের জন্য রাজাকে মরতে হয়েছিল। আমার অজ্ঞাতবাস চলাকালীন সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করব। যদি অসফল হই তাহলে হয়তো আমার লাশটাও জঙ্গলের কোনও কোণায় পড়ে থাকবে। কিন্তু তাতে কী? বেঁচে থেকেও তো কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে না। অন্য অনেকের মতো আমিও রাজার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে করি। সেদিন হয়তো আমার ভুলের জন্যই ওকে মরতে হয়েছিল। মরতে হয়েছিল এই সমস্ত কিছুর পিছনে থাকা দ্বিজেন মাহাতকে। দু' দুটো অপঘাত মৃত্যুর দায় আমার কাঁধে তো ছিলই, আজ আবার তাপসী কাকিমার আত্মহত্যার দায়ও আমার কাঁধেই এসে পড়ল। আইন আদালতের চোখে আমি নির্দোষ হলেও নিজের বিবেকের চোখে আমিই তো অপরাধী।

আজ যখন আমি সুযোগ পেয়েছি, তখন যে কোনও মূল্যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করব। যে বিশাইয়ের কারণে আমার জীবনটা নরক হয়ে উঠেছে, যার জন্য তিন তিনটে মানুষের জীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেল, সেই বিশাইকে এমনিই এমনিই ছেড়ে দেবো কেন! সেদিন আমি এসব ব্যাপারে কিছুই জানতাম না, তাই আমার চোখের সামনেই বিশাই রাজাকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এখন তো আমি আর আনাড়ি নই, গুরুদেবের শেখানো বিদ্যার প্রয়োগ করে আমি নিশ্চয়ই বিশাইকে পরাস্ত করে রাজার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারব।

নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করে শেষ পর্যন্ত যাওয়াটাই স্থির করলাম। বাড়িতে বোঝানোটা সমস্যা ছিল, কারণ যত সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল ওই জঙ্গলবাড়িতেই। তাই বাবা-মা কিছুতেই আমাকে আবার সেই জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে চাইবে না। সেজন্য একরকম নিরুপায় হয়েই মিথ্যার আশ্রয় নিতে

হলো। বাড়িতে বললাম, ঝালদার গ্যারেজটা তো কর্মচারিরাই চালাচ্ছে এতদিন। গিয়ে দেখি, সেখানের কী অবস্থা হয়েছে।

ঝালদার নাম শুনেই অবশ্য মা যথারীতি আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে আমার পক্ষ নিতে মাকে রাজি হতে হলো।

বাড়িতে অনুমতি পেয়ে যেতেই আমি ঝালদা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। তারপর একদিন সকালে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঝালদার উদ্দেশে। ঘটনার প্রথম অধ্যায়টির শুরু ওখান থেকেই হয়েছিল, কী জানি, হয়তো শেষও ওখানেই হতে চলেছে।

৯

ঝালদা থেকে যে রাস্তাটা বুরদার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাঘমুণ্ডির দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার একটা বাঁকের মুখে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিকেলের সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। অবশ্য শীতের দিনে বিকেলবেলা বলে কিছু হয় না, দুপুর শেষ হতে না হতেই সন্ধ্যার অন্ধকার এসে চারিদিক ঘিরে ধরে। দূরে ফাঁকা প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শাল মহুয়ার গাছগুলোর ওদিক থেকে ধোঁয়ার মেঘের মতো একটা আস্তরণ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এদিকে শীতকালে এরকমটা প্রায়ই দেখা যায়। রাস্তাটা একদম নির্জন, অনেক দূর পর্যন্ত কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। কালো পিচ ঢালা রাস্তাটা একলাটি এঁকেবেঁকে গিয়ে দূর দিগন্তে মিশে গেছে। জঙ্গলের পথে পাড়ি জমানোর আগে আরেকবার নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সত্যিই আবার ওই জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যেতে চাই?

এতগুলো বছর হয়ে গেল বাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। রাজার সঙ্গে সেই দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর আজ এতগুলো বছর ওমুখো হইনি। তাহলে আজ এতদিন পরে হঠাৎ সেখানে যেতে চাইছি কেন? যে বাড়িটা এতগুলো মানুষের অকালমৃত্যুর কারণ হলো। যে বাড়িটাকে আমি এতদিন একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ সেই বাড়িটাই যেন আমাকে কোন

এক অমোঘ আকর্ষণে টানছে। সেই প্রচণ্ড আকর্ষণের কাছে হার মেনেছে মৃত্যুভয়। দ্বিজেন মাহাতর রহস্যে ঘেরা মৃত্যুর আজও কোনও কিনারা হয়নি। পুলিশের চোখে সেই ঘটনাটা একটা নিছক খুনের কেস হলেও এলাকাবাসীদের কাছে সেটি অশুভ এক আতঙ্কের ইঙ্গিত হয়ে আছে।

যে ঝড়টা আজ থেকে পাঁচবছর আগে হঠাৎ ছুটে এসে তাণ্ডব শুরু করেছিল তা হয়তো এখনও থেমে যায়নি, দূরে কোথাও লুকিয়ে শক্তিসঞ্চয় করে চলেছে। সুযোগ পেলেই আবার সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশেপাশে থাকা সমস্ত কিছুকে তছনছ করে নিয়ে যাবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি, ফিরে যাবার আর কোনও কারণ তো দেখছি না। পাঁচবছর আগে যে মানসিক যন্ত্রণা আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল, আজ আবার সেই যন্ত্রণা নিয়েই আমি এখানে ফিরে এলাম। তবে এই যন্ত্রণাটার জন্য দায়ী আমি নিজেই। নিজেকে আর কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায় বুঝতে পারছি না। আমি সবার থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাই, আমার উপস্থিতি যেন আর কারও বিরক্তির কারণ না হতে পারে। আমি আর কারও বিরক্তি বা ক্ষতির কারণ হতে চাই না। সে জন্যই একবার ওই বাড়িতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চাই। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহলে এই বিরক্তিকর মানুষটি চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। আর যদি বেঁচে থাকি তাহলে রাজার নৃশংস মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েই আমি ফিরব।

চোয়াল শক্ত করে আমি বাইকে স্টার্ট দিলাম, সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে জঙ্গলবাড়িতে।

সন্ধ্যে নামার কিছু আগেই জঙ্গলবাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আসার পথে পাথর বাদানটা চোখে পড়ল, ঝোপজঙ্গলে জায়গাটা একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখেও মনে হলো এদিকে এখন আর কেউ আসে না। দ্বিজেন মাহাতর ওই রকম মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আশেপাশের এলাকায় এই জায়গাটি নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তার রেশ এখনও কাটেনি

দেখছি। আমি যখন জঙ্গলের পথে আসছিলাম তখনও রাস্তায় কাউকে দেখতে পাইনি। যে আদিবাসী মহিলারা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে আসত প্রতিদিন, তাদেরও দেখা পেলাম না। পুরো জঙ্গলটা কেমন যেন নিঝুমপুরী হয়ে গেছে। সন্ধ্যের মুখে এই সময় হাজার হাজার পাখির ডাকে জঙ্গল একেবারে সরগরম হয়ে থাকত, এখন যেন চারিদিকে মৃত্যুর নীরবতা জমাট বেঁধে আছে।

আগে হলে হয়তো খুব অবাক হতাম, কষ্ট পেতাম জঙ্গলের এই নিস্তব্ধতা দেখে। কিন্তু এখন জানি যে এই রকমটাই স্বাভাবিক, জঙ্গলে আগের সেই আনন্দময় পরিবেশ আর নেই। ভয়ংকর বিশাইয়ের উত্থানের পর শান্ত পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়ে নরকের দমবন্ধ করা আতঙ্কের পরিবেশ ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে আমার ভীষণ প্রিয় এই জঙ্গলটিকে। আমার অপরিণামদর্শিতার জন্যই আজ জঙ্গল তার ছন্দ হারিয়েছে। আমিই দায়ী, একমাত্র আমিই দায়ী এই পরিস্থিতির জন্য।

ঝোপজঙ্গলের আড়ালে বাড়িটা এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেছে যে বাইরে থেকে বোঝাই যাচ্ছিল না। পুটুস, জলবিছুটি এবং আরও কত নাম না জানা আগাছা পুরো বাড়িটাকে একেবারে মুড়ে ফেলেছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, কোনও জায়গা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত পড়ে থাকলে প্রকৃতি তার দখল নিয়ে নেয়। যে রকম ঝোপজঙ্গল হয়েছে তাতে মেইন গেট থেকে বাড়িটার ভিতরে ঢুকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। আজ তো আর কিছু করা যাবে না, রাতটা কোনও মতে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকাল থেকেই ঝোপ কাটাইয়ের কাজে লেগে পড়তে হবে। বেশি কিছু না, শুধু বাড়িটার আশেপাশের ঝোপজঙ্গলগুলো পরিষ্কার করে নিলেই দিব্যি নিজের মতো করে থাকা যাবে।

বাইকটা উঠোনের আম গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে ঝোপ ঠেলে কোনও রকমে ঘরের বারান্দার কাছে পৌঁছলাম। বারান্দার গ্রিলের দরজাটা তালাবন্ধই আছে। বোঝাই যাচ্ছে আমি ছেড়ে যাওয়ার পর এই পাঁচবছরে কেউ আসেনি এদিকে। অবশ্য চুরি

ডাকাতির ভয় এই এলাকায় কখনও ছিল না। আশেপাশে জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা আদিবাসীদের গ্রাম ছাড়া আর কোনও লোকালয় নেই। আর জঙ্গলের এই আদিবাসীরা যথেষ্ট ভদ্রসভ্য মানুষ। তথাকথিত ভদ্রলোকদের কানে ধরে ওরা সভ্যতা শেখাতে পারে। ওরা নিজেদের নিয়ে থাকে, কারও কোনও ব্যাপারে কখনওই নিজেদের জড়ায় না।

তালাটা খোলার চেষ্টা করে দেখলাম জং লেগে গেছে, কিছুতেই চাবিটা ঘোরানো যাচ্ছে না। এখানে আসার আগে ঝালদাতে আমার গ্যারেজে গিয়ে এই জঙ্গলবাড়ির চাবিটাবি সব নিয়েই এসেছি। আসার সময় একটু কেরোসিন বা মোবিল নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। ওই দিয়ে ভিজিয়ে নিলে তালাটা খুব সহজেই খুলে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তার জন্য সময় নেই। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখন এই জঙ্গলের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় বাইরে থাকাটা ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। নাহ, আর চেষ্টা করে লাভ নেই, তালাটা ভাঙতেই হবে দেখছি। এদিক ওদিক খুঁজে একটা বড় পাথর দেখতে পেলাম। পাথরটা তুলে এনে কয়েক ঘা দিতে জং ধরে থাকা তালাটা খুলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে গেছে। যদিও শীতকাল তবু এই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে বাইরে থাকাটা একেবারেই নিরাপদ নয়। মরচে ধরে দরজাটা একেবারে জ্যাম হয়ে আছে, লাথি মেরে মেরে গ্রিলের দরজাটা খুলে বারান্দায় উঠে পড়লাম। বারান্দার অবস্থা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। রাশি রাশি শুকনো পাতা আর নোংরাতে পুরো বারান্দাটা একেবারে ভর্তি হয়ে আছে। এসব পরিষ্কার করতে আমাকে বেশ খাটতে হবে। ভিতরের ঘরের তালাগুলো অবশ্য ভালোই রয়েছে দেখলাম, একটু কসরত করতেই খুলে গেল। দরজা খুলে ভিতরে পা রাখতেই একটা ভাপসা গন্ধ এসে নাকে লাগল। পাঁচবছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে ঘরটা, বন্ধ হয়ে থাকা গ্যাসটা বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। দরজা জানালাগুলো খুলে দিয়ে আবার উঠোনে বেরিয়ে এলাম, তারপর বাইকটাকে টেনে

নিয়ে এসে বারান্দায় তুলে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

রাত্রে খাওয়ার মতো খাবার আর জল আমার সঙ্গেই এনেছি। কাল থেকে আবার সব গুছিয়ে নিয়ে রান্নাবাড়া শুরু করলেই হবে। জঙ্গলে জ্বালানি কাঠের অভাব নেই, কাঠ কুড়িয়ে এনে দিব্যি রান্নাবান্না করতে পারব। বাইরের কুয়োটা থেকেই খাবার জলও পাওয়া যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন অব্যবহৃত পড়ে থেকে ওটার কী অবস্থা হয়েছে কে জানে। অন্ধকার হয়ে গেছে বলে এখন আর দেখাও যাবে না। সে যাই হোক, কাল সকালে সম্ভব হলে লোকজন ডেকে কুয়োটা ঝালিয়ে নিতে হবে। নাহলে প্রয়োজনীয় জলের অভাবে এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়বে। জঙ্গলের ভিতরে একটা ঝরনা আছে বটে, কিন্তু সেখান থেকে প্রতিদিন খাবার জল বয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব।

ঘরের ভিতরে সবকিছু আগের মতোই আছে। আমার খাট, বিছানা, রান্নার বাসন সব আগের মতোই গুছিয়ে রাখা। ঘরময় কেমন একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরভর্তি ধুলো এবং মাকড়শার জালের মধ্যেও কেমন একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মনটা হঠাৎ করে ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, এই ঘরটাতেই একদিন আমি রাজা আর তাতান মিলে কত আনন্দ করেছিলাম। সেটা এমনই এক শীতের রাত ছিল, যে রাতে আমাদের জীবনে ওই ভয়ংকর অভিশাপ নেমে আসে। আজ রাজাও নেই, তাতান কোথায় কত দূরে চাকরি করছে জানি না। আর আমি এখানে এই জঙ্গলে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে এসেছি। অতীত মানুষকে বড় নিঃসঙ্গ করে দেয়, তেমনই আবার স্মৃতির প্রবাহে জাগতিক চিন্তা ভাবনাগুলোও কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে অতীতের ভারে ভারাক্রান্ত আমি বর্তমানের যন্ত্রণা ভুলে যেন আবার আগের মতো একাকীত্বের আনন্দানুভূতিগুলো ফিরে পেলাম।

১০

উফফফ, কতদিন পর আবার আমার এই নির্জন বনবাস ফিরে পেলাম। এই তো আমার প্রকৃত জায়গা, আমার একমাত্র আশ্রয়। শহরের আধুনিক পরিবেশে আমার দমবন্ধ লাগে। মেকি আধুনিকতার মুখোশ পরে বাঁচা যায় নাকি! চারিদিকে স্বার্থপরতার মধ্যে বেঁচে থাকে অন্তঃসারশূন্য কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। যারা প্রকৃতিপ্রেমী তারাও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ওই আধুনিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকেও ভিতরে ভিতরে তারা প্রতিদিন পুড়তে থাকে একাকীত্বের আগুনে। আমিও ওই আগুনে পুড়ছিলাম, হয়তো নিজের ইচ্ছেতেই পুড়তে চেয়েছিলাম। জীবনের যন্ত্রণাগুলো আমাকে কোথাও টিকতে দেয় না, কেবল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এখান থেকে ওখানে। সরল বিশ্বাসে ভালোবাসা খুঁজে বেড়াই। কোথাও এত ভালোবাসা পাই যে তা হারানোর ভয় আমাকে গ্রাস করে এবং আবার পালাতে বাধ্য করে। আবার কোথাও আমার ভালোবাসা, আমার বিশ্বাস ক্ষতবিক্ষত হয় স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে। তার থেকে আমার এই একাকীত্বই ভালো।

জানি না কতক্ষণ বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করছিলাম। বাইরে থেকে একটা অদ্ভুত গোঙানির শব্দ ভেসে আসাতে সম্বিত ফিরে পেলাম। শব্দটা বারান্দার বাইরে থেকেই আসছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে টর্চটা বার করলাম। এখানে তো ইলেকট্রিসিটি নেই, তাই মোমবাতি থেকে শুরু করে চার্জার লাইট— সব সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে টর্চের আলোয় দেখলাম একটা কালো রঙের কুকুর গ্রিলের দরজাটার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। কুকুরটাকে দেখে একটু অবাকই হলাম। এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে কুকুর কোথা থেকে এলো! আশেপাশের গ্রামগুলোও তো অনেকটাই দূরে।

বেশ তাগড়াই কুকুর, কিন্তু কোনও কারণে ভয় পেয়েছে

বলেই ওরকম গোঙাচ্ছে। দরজাটা আমি তখন বন্ধ করিনি, শুধুমাত্র ভেজিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু জং ধরে এঁটে যাওয়ার জন্য কুকুরটা ঠেলেও খুলতে পারেনি। তাড়াতাড়ি দরজাটা টেনে খুলে দিতেই কুকুরটা লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকে এলো। বারান্দায় ঢুকেই এক কোণে গিয়ে লেজ গুটিয়ে বসে মুখ দিয়ে 'কুঁই কুঁই' করে অদ্ভুত গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগল। বুঝলাম, কোনও কারণে কুকুরটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু কীসের ভয়!

ব্যাপারটা দেখার জন্য টর্চ নিয়ে উঠোনে নেমে পড়লাম। চারিদিকে যে রকম ঝোপঝাড় হয়েছে তাতে কিছু নজরে পড়াই মুশকিল। তার মধ্যেও টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলাম, কিন্তু জমাট অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ঝুপসি গাছগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। চারিদিক দেখে নিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে এলাম। দেখলাম কুকুরটা জড়োসড় হয়ে বারান্দার এক কোণে বসে আছে। আমাকে ফিরতে দেখে আরও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে করুণ সুরে ডেকে উঠল। কী জানি, হয়তো আমাকে দেখেও ভয় পাচ্ছে। দেখে মায়া লাগল, ধীরে ধীরে কুকুরটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে মাটিতে ঝুঁকে বসলাম। আস্তে করে ওর মাথায় হাত রেখে মুখ দিয়ে 'চুকচুক' আওয়াজ করতে একটু শান্ত হলো। টর্চের আলোয় দেখলাম, ওর সামনের ডান পায়ে একটা গভীর চোট রয়েছে। একদম টাটকা ক্ষত, এখনও রক্ত ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান দিয়ে। এই জন্যই বেচারা ভয় পেয়ে গেছে। আহারে! অবলা প্রাণী, কিছু বলতেও পারছে না। কোনও দুষ্টু ছেলে হয়তো পাথর-টাথর ছুঁড়ে মেরেছে। ঘরের ভিতর ব্যাগের মধ্যে ফাস্ট এইডের সরঞ্জাম আছে, দেখি বেচারার জন্য কী করা যায়। কিন্তু তারও আগে ওকে কিছু খেতে দিতে হবে, নাহলে ওর চিকিৎসা করা যাবে না। ভয় পেয়ে কামড়ে দিতে পারে। দু'হাতে কুকুরটাকে তুলে বারান্দায় সিমেন্টের বেঞ্চটার উপর বসিয়ে দিলাম। বেশ ভারি কুকুর, জাতে দেশি হলেও চেহারাটা বিরাট।

আমার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে রুটি আর মাংস ছিল, তার থেকে কিছুটা ওকে দিলাম। চেটেপুটে খেলো কুকুরটা। বুঝলাম

বেশ খিদে পেয়েছিল ওর। খাওয়া হলে ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে এসে বেটাডিন দিয়ে ওর পায়ের ক্ষত পরিষ্কার করে, বোরোলিন লাগিয়ে শক্ত করে পা-টা বেঁধে দিলাম। নাহ, কুকুরটা কোনও বাধা দিলো না, অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল শুধু। হয়তো এই অপ্রত্যাশিত ভালোবাসায় অবাক হচ্ছিল। জানি না কাদের পোষা কুকুর, কীভাবে আহত হয়ে জঙ্গলে চলে এসেছে। কিন্তু এখন তো আর ওকে ছেড়ে দিতে পারি না, এরকম আহত অবস্থায় ওকে পেলে জঙ্গলের হায়েনারা ছিঁড়ে খাবে। কী জানি, হয়তো হায়েনাতেই ওকে জখম করে দিয়েছে। হায়েনার কথাটা মাথায় আসতেই তাড়াতাড়ি বারান্দার দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিলাম। কুকুরটা ভয়ার্ত চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে 'কুঁইকুঁই' শব্দ করছে দেখে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর পাশেই বেঞ্চের উপরে বসে পড়লাম। আমি বসার পর একটু শান্ত হলো বেচারা।

আগেও এখানে বসেই রাত্রে জঙ্গলের শোভা দেখতাম। কিন্তু জঙ্গলের সেই শোভা এখন আর নেই। রাতচরা পাখি বা জীবজন্তু তো নয়ই একটা ঝিঁঝিঁ পর্যন্ত ডাকছে না। এরকম নিস্তব্ধ জঙ্গল আমি আগে কখনও দেখিনি। সমস্ত প্রকৃতি যেন কোন এক অজানা আশঙ্কায় থম মেরে গেছে। এই মনমরা দুঃখী জঙ্গল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কুকুরটা আমার পাশে দু'পায়ের মধ্যে মাথাটা রেখে চুপ করে বসেছিল। মাঝে মাঝে মাথাটা তুলে তাকাচ্ছিল বাইরের দিকে। নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে ওর মনটাও হয়তো এখন শান্ত হয়েছে, ওর সেই ছটফটে ভাবটা আর নেই।

সিগারেটটা শেষ করে ঘরের ভিতরে ঢুকলাম, পিছন পিছন কুকুরটাও ভিতরে এলো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে দেখে বুঝলাম ওর পায়ে ভালোই চোট হয়েছে। কাল সকালে ওর পা-টা ভালো করে দেখে 'হাড়জুড়ির' শেকড় আর পাতাবাটা দিয়ে বেঁধে দেবো। যদি হাড় ভেঙে থাকে তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।

ঝাঁটা দিয়ে তক্তপোষটা ঝেড়ে বিছানা পেতে ফেললাম। আজ

পাঁচবছর ধরে বিছানাগুলো বস্তার মধ্যে বাঁধা পড়েছিল। সেগুলো থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোচ্ছে। ব্যাগ খুলে রুম-স্প্রে বার করে স্প্রে করতে গন্ধটা কাটল। নতুন বেডিংটা খুলে একটা চাদর বার করে বিছানার উপর পেতে দিলাম। আজ আর এর বেশি কিছু করা যাবে না, সারা দিন শরীরের উপর কম ধকল যায়নি। এবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ব, কাল সকালে উঠে আবার অনেক খাটাখাটুনি করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানা রকমের চিন্তা মাথায় আসছিল, ঘুম আসছে না কিছুতেই। মোমবাতির আলোয় কিছুক্ষণ গল্পের বই পড়লাম, কিন্তু আজ কিছুতেই যেন মন বসতে চাইছে না। কুকুরটা আমার তক্তপোষের নীচেই একটা চটের বস্তার উপর শুয়ে আছে। ওর আগমনটাও একটু বিস্ময়কর বইকি। তবে কুকুরের মতো বিশ্বস্ত প্রাণী কাছে থাকলে মনে একটা আলাদা জোর পাওয়া যায়।

কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। এই নির্জন জঙ্গলে এভাবে একা একা কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়। তবে এই বাড়ির মধ্যে যা যা ঘটেছে তাতে গা-টা একটু ছমছম করছে বইকি। আমি জানি, এটা দু' একদিনের মধ্যেই কেটে যাবে, সব কিছুই আসলে অভ্যাস। এপাশ ওপাশ করতে করতে একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ একটা তীব্র গর্জনের শব্দে চমকে উঠে বসলাম।

ঘরের পিছন দিক থেকে শব্দটা এলো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ওই একবারই আওয়াজটা হয়ে থেমে গেল। কুকুরটাও চমকে গিয়ে আবার 'কুঁইকুঁই' করতে শুরু করল ভয়ে। বালিশের পাশে রাখা টর্চটা নিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে পিছন দিকের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জানালার উপরের পাল্লা দুটো খোলা ছিল, সেটা দিয়ে বাইরের জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। তবে আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি জানালার ওপারে কিছু একটা অবশ্যই হচ্ছে। পিছন দিকে একটা সিমেন্টের দাওয়া মতো আছে, তাতে কেউ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ের

একটা 'খসখস' আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কেউ যেন মোষের মতো জোরে জোরে শ্বাস ছাড়ছে। হায়েনা বা ভাল্লুক হতে পারে। হয়তো ফাঁকা বাড়ি পেয়ে আড্ডা জমিয়েছে। কাল সকালে ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে।

কুকুরটা দেখি পায়ে পায়ে আমার কাছেই চলে এসেছে, কেমন একটা অস্থির ভাব ওর মধ্যে। বেচারি কথা বলতে জানলে হয়তো ওর ভয়ের কথা খুলে বলতে পারত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। মুখ দিয়ে অবিরাম 'কুঁইকুঁই' আওয়াজ করে হয়তো আমাকে সাবধান করতে চাইছিল কুকুরটা। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইলাম কিন্তু ওর ছটফটানি কমলো না।

জানালার কাছ থেকে বিছানার দিকে ফিরে আসছি, ঠিক তখনই জানালা দিয়ে কিছু একটা বোঁ করে উড়ে এসে ঘরের ভিতরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে দরজার ওদিকে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক জোরে চিৎকার করে উঠল কুকুরটা। ছুটে জানালার কাছে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে শুরু করল। হতচকিত ভাবটা কেটে যেতেই আমি ছুটে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, জানালার ওদিকে দাওয়ার উপর থেকে কোনও একটা ভারি জিনিস কেউ ওপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে ঘষটে ঘষটে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা নিজের লেজ পিছনের দু'পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে ভীষণ ভয়ে তারস্বরে ডেকেই যাচ্ছিল। ওকে ধরে বিছানার কাছে নিয়ে এসে বসালাম। বুঝলাম, ও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। কী যে হলো তা আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।

কুকুরটা ধীরে ধীরে একটু শান্ত হলো, বস্তার উপর গুটিসুটি মেরে বসে 'কুঁইকুঁই' করতে লাগল। ও শান্ত হতে টর্চ জ্বেলে খুঁজে দেখলাম; দরজার কাছে একটা রক্তমাখা হাড়ের টুকরো পড়ে আছে। খানিকটা চামড়া এবং কাঁচা মাংসও লেগে রয়েছে হাড়টায়। হে ভগবান! জানি না কোন হতভাগ্য প্রাণীর এই দুরাবস্থা হয়েছে। তবে এটা বুঝতে পারছি যে বিশাই তার এলাকা ছেড়ে যায়নি। সে এখনও বহাল তবিয়তেই এখানে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে।

বিশাইয়ের কথা মনে হতেই একবার গলায় হাত দিয়ে দেখে নিলাম। নাহ, সাধুবাবার দেওয়া মালাটা এখনও আমার গলাতেই আছে। দ্বিজেন মাহাত বলেছিলেন, এটা থাকতে বিশাই আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য গুরুদেবের কাছে আমি যে বিদ্যা শিখেছি তাতে বিশাইকে ভয় পাওয়ার মতো কারণ আর নেই। কিন্তু তবুও বিশাই ভয়ংকর, তার অপরিসীম শক্তির কথা আমি জানি। আমার সামান্য ভুলেও প্রাণসংশয় হয়ে যেতে পারে। ওই হিংস্র নিষ্ঠুর বিশাই আমাকে কোনও সুযোগ দেবে না। আর এখন তো বিশাই আমার উপস্থিতির কথাটা জেনেই গেছে, সেজন্যই হয়তো ভয় দেখিয়ে আমাকে সাবধান করতে চাইল। বেশ বুঝতে পারছি যে আমার এখানে থাকাটা এত সহজ হবে না। ও নানাভাবে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবেই। জানি না কপালে আর কী কী দুর্ভোগ লেখা রয়েছে। কিন্তু যা-ই হয়ে যাক, আমার ভয় পাওয়া চলবে না। ওই বিশাইয়ের জন্য আমাকে প্রতি মুহূর্তে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। ওর শেষ না দেখে আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না।

কুকুরটা জড়োসড় হয়ে বসে আছে দেখে ওর মাথায় আবার হাত বুলিয়ে দিলাম। বললাম, "এসেই যখন পড়েছিস তখন আমার সঙ্গেই থাক। সেদিন আমি এসব বিষয়ে কিছুই জানতাম না বলে আমার প্রিয় বন্ধুকে বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু তুই আমার আশ্রিত, আমি বেঁচে থাকতে তোর কোনও ক্ষতি হতে দেবো না।"

১১

রাত্রে আরও একবার জানালার বাইরে হুটোপুটি আর গর্জনের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। কুকুরটাও ভয় পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করেছিল যথারীতি। কিন্তু তারপর আর কোনও উপদ্রব হয়নি বটে তবে আমরাও সারা রাত ভালোভাবে ঘুমোতে পারিনি।

সকালে একটু তাড়াতাড়িই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। কুকুরটা রাত জেগে ডাকাডাকি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার

পায়ের শব্দে জেগে উঠে আমার সঙ্গেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো।

বারান্দায় দড়ি বালতি রাখাই ছিল, সেগুলো নিয়ে কুয়ো থেকে জল তুললাম। নাহ, যতটা ভেবেছিলাম ততটা খারাপ অবস্থা নয়। ডালপাতা পড়ে কুয়োর জল নোংরা হয়েছে বটে তবে কাজ চালানো যাবে। বাথরুমটাও দেখলাম ভালোই রয়েছে, ব্যবহার করা যাবে। তবে যথেষ্ট পরিমাণে ধুলো ময়লা জমে গেছে সব জায়গায়। কুকুরটা বারান্দার দরজায় বসে জিভ বার করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল। ওকে পাহারায় রেখে বালতিতে জল ভরে বাথরুমে ঢুকলাম প্রাতঃকৃত্য সারতে।

সারাদিন আজ অনেক কাজ আছে। ঘরদোর সাফ করতে হবে, যতটা সম্ভব ঝোপজঙ্গলগুলো কাটতে হবে। তারপর ঝালদা গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস কিনে নিয়ে আসতে হবে। রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে চাল-ডাল, শাক-সবজি সমস্তই কিনতে হবে। জানি না এখানে কতদিন থাকব, প্রতিদিন খাবার কিনে এনে খাওয়া তো আর সম্ভব নয়। প্রাতঃকৃত্য ও স্নানটান সেরে বাথরুম থেকে বেরোতে যাব এমন সময় কুকুরটা 'ঘেউ ঘেউ' করে ডেকে উঠল। আবার কী দেখল কে জানে!

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি কুকুরটা বাইরের গেটের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে ডাকাডাকি করছে। সেদিকে তাকাতে দেখলাম একজন আদিবাসী লোক, হাতে একটি কুড়ুল নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু কুকুরটার জন্য ভয়ে এদিকে আসতেও পারছে না। ইশারায় লোকটাকে ভিতরে আসতে বললাম। লোকটা একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করে জানলাম ও পাশেই চাটুমঘুতু গ্রামে থাকে। প্রায়ই জঙ্গলে কাঠ কাটতে আসে। এদিকটাতে যদিও কোনও দিন আসে না, তবে কালকে সন্ধ্যের মুখে আমাকে বাইক নিয়ে এদিকে আসতে দেখে ওর কৌতূহল হয়েছিল। তাই আজ সকালে দেখতে এসেছে।

একেই বোধহয় বলে মেঘ না চাইতেই জল। আমি ঝোপঝাড়

পরিষ্কারের জন্য লোক খুঁজছি বলাতে ও নিজেই কাজটা করতে রাজি হয়ে গেল। যাক বাবা, আমাকে তাহলে আর কিছু করতে হবে না। লোকটার নাম টোকেন মুর্মু, বড় অদ্ভুত নাম। কেন এরকম নাম তা আর জানতে চাইলাম না। ওকে সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিয়ে কুকুরটাকে ওর কাছে রেখে বাইক নিয়ে ঝালদা যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ও ঘরদোর পরিষ্কার করুক, আমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে নিয়ে আসি। ব্যাগে শুকনো খাবার কিছু ছিল, সেগুলো ওকে দিয়ে দিলাম। আমি দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব। আপাতত ওই খাবারে ওদের দু'জনের চলে যাবে। খাবার পেয়ে টোকেন মুর্মু খুব আনন্দের সঙ্গে ঝোপঝাড় কাটতে লেগে গেল। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত্রের ঘটনাটা মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। বাইক চালাতে চালাতে সেজন্যই বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। ঘুম থেকে উঠে বাড়িটার পিছন দিকে গিয়ে দেখাও হলো না। ভেবেছিলাম বাথরুমের কাজ সেরে ঘর পরিষ্কার করার সময় দেখব। কিন্তু ওই টোকেন মুর্মু এসে যাওয়াতে ব্যাপারটা মাথা থেকে বেমালুম বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে মনে পড়ছে যে কাল রাত্রের সেই হাড়ের টুকরোটাও ফেলা হয়নি। টোকেন মুর্মু ওটা দেখে ফেললে কী মনে করবে কে জানে। লোকটা গ্রামের সহজ সরল মানুষ, একটু পাগলাটেও বোধহয়। চাটুমঘুতু গ্রামটা আমার জঙ্গলবাড়ি থেকে একটু দূরে এবং আমার যাতায়াতের রাস্তায় পড়ে না বলেই ওদিকের লোকজনের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ পরিচয় নেই। নাহলে টোকেন মুর্মুকে আমি চিনতে পারতাম। যাক গে, ও নিজের কাজ করুক, আমাকে বাজার হাট সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

দেখতে দেখতে জঙ্গল ছাড়িয়ে পাথর খাদানটার কাছে এসে পড়লাম। দিনের আলোয় জায়গাটা আরও স্পষ্ট ভাবে চোখের সামনে ফুটে উঠল। পরিত্যক্ত পড়ে থাকার দরুণ খাদানের পুরো

এলাকাটা ঝোপজঙ্গলে একেবারে ভরে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে এদিকে বড় একটা কেউ আসে না। চারিদিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সামনে একটা ছোট্ট বাঁকের মুখে বাইকটা স্লো করতে হলো। রাস্তার দু'দিকে খাদানের বড় বড় পাথর ঢিবি করে রাখা হয়েছিল এক সময়। এখন সেগুলোতে নানারকম গাছপালা আর ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠে টিলার আকার ধারণ করেছে। সেই টিলার ওদিক থেকে কয়েক জন লোকের গলার আওয়াজ পেয়ে আমি বাইক নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে কয়েক জন আদিবাসী মানুষ খুব উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছে। দেখতে দেখতে ওরা সামনে এসে পড়ল।

জনা সাতেক লোক হাতে কুড়ুল, টাঙ্গি আর বল্লম নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এদিকেই এগিয়ে আসছিল। সামনে আসাতে ওদের কয়েক জনকে চিনতেও পারলাম। ওপাশের কাঁড়বাঁধি গ্রামের লোক সব, দ্বিজেন মাহাতর কাছে যখন বাড়িটা কিনি তখন এদেরই কয়েক জনকে দিয়ে আমি জঙ্গলবাড়িটা মেরামত করিয়েছিলাম। এছাড়াও শিবু এবং শংকরের সঙ্গে আমার অনেক পুরোনো বন্ধুত্ব। এতদিন পর ওদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব ভালো লাগল। আমাকে দেখে ওরাও থমকে দাঁড়াল, অবশ্য প্রথমটা ওরা আমাকে চিনতে পারল না। আমি হাতজোড় করে 'জোহার' বলতে শিবু টুডুই সবার প্রথমে আমাকে চিনতে পারল।

আগের থেকে অনেকটাই মোটা হয়েছি, তাছাড়া মুখে দীর্ঘদিনের না কাটা দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের জন্য চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। অনেক দিন পর আমাকে দেখে শিবু এবং শংকর দু'জনেই যেমন ভীষণ খুশি হলো, তেমনি অবাকও কম হলো না। শিবু এগিয়ে এসে বলল, "আরে পণ্ডিত, তুই! তুই আবার কবে আলি?"

আমি হেসে বললাম, "এই তো, কালকেই এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। তা তোরা সবাই মিলে কোথায় যাচ্ছিস? শিকারে বেরিয়েছিস নাকি?"

আমার কথা শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। আমি যে আবার এখানে ফিরে আসব সেটা হয়তো ওরা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। শংকর টাঙ্গি কাঁধে নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। টাঙ্গিটা কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে বলল, "তুই কাল রাতে ইখানেই ছিলিস নাকি?"

"হ্যাঁ, তাছাড়া আর যাব কোথায়।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন, কিছু হয়েছে নাকি আবার?"

শিবু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, শুনতে পেলাম না। হয়তো মারাংবুরুর কাছে প্রার্থনা করে নিলো। তারপর খপ করে আমার হাতটা ধরে উত্তেজিত স্বরে বলল, "সত্যি করে বল পণ্ডিত, তু সারারাত ই জঙ্গলেই ছিলিস? ওই ঘরটায় ছিলিস?"

এইবার আমার একটু একটু কৌতূহলও হলো। বললাম, "আরে বাবা তোদের কি মিথ্যে বলছি নাকি! কাল সারারাত আমি এখানেই ছিলাম।" একটু থেমে ওদের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বললাম, "এখন থেকে আমি এখানেই থাকব, কিন্তু কী হয়েছে খুলে বল তো।"

ওরা চোখ বড়বড় করে আমাকে দেখছিল, হয়তো আমার কথা ওদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। নাহ, ব্যাপারটা সন্দেহ জনক মনে হচ্ছে। শিবু মাথা নেড়ে বলল, "খুব বেঁচে গেলিস পণ্ডিত! তুই তো ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলি, উ বিশাই ট আমাদের কি কম জ্বালাতন করলেক!" শিবু অদৃশ্য বিশাইয়ের উদ্দেশে একটা খিস্তি দিয়ে আবার বলল, "তু বলছিস রাতে জঙ্গলেই ছিলিস! তো তুই কিছু বুঝতে পারিস নাই?"

বিশাইয়ের কথা শুনেই কান খাড়া হয়ে গেল আমার। কাল রাত্রে আমার সঙ্গে যা ঘটেছে সেটা ওদের আর খুলে বললাম না। বললাম, "বিশাইটা এখনও আছে নাকি? আমি তো শুনেছিলাম ও এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।"

শিবু ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় যা বলে

গেল তা শুনে আমি সত্যিই খুব অবাক হলাম।

আজ পাঁচবছর ধরে আশেপাশের গ্রামের কেউ নাকি ভয়ে এদিকের জঙ্গলে আসে না। যারা জঙ্গলের কাঠ আর পাতা-পাতা কুড়োতে আসত তারাও এখন এদিকের জঙ্গলটা এড়িয়ে চলে। দ্বিজেন মাহাত মরার পর জঙ্গলে নানান অঘটন ঘটতে শুরু করেছিল। প্রথমে একজন পাতাকুড়ানি মহিলা নিখোঁজ হয়ে যায় জঙ্গলে পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে। অনেক খুঁজেও তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েক দিন পর জঙ্গলের মধ্যে তার রক্তমাখা ছেঁড়াখোঁড়া শাড়িটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। সবাই ভেবেছিল হাতি কিম্বা হায়েনার কাজ, কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই আবার একজন জোয়ান ছেলে নিখোঁজ হয় জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে। যথারীতি তারও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে জঙ্গলের গভীরে তার কুড়ুলটা খুঁজে পাওয়া যায়। দু' দুজন মানুষ নিখোঁজ হবার পর গ্রামের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে এইসব নিয়ে কুসংস্কার একটু বেশি তাই ঝাড়খণ্ড থেকে একজন 'জানগুরু'কে নিয়ে আসা হয় ঘটনাটির ব্যখ্যা জানার জন্য। সেই জানগুরুই নাকি ওদের বলে যে এখানে বিশাইয়ের প্রকোপ পড়েছে। এবং সবাইকে এদিকের জঙ্গলে বা পাহাড়ে আসতে নিষেধ করে। ওরা জানগুরুর কথামতো জঙ্গলে ঢোকা বন্ধ করে। এমনকি এই পাথর খাদান পেরিয়ে যে ফাঁকা প্রান্তরটা আছে সেখানে যারা গোরু চরাতে আসত তারাও এদিকে আসা বন্ধ করে দেয়।

কিছুদিন ভালোই কেটেছিল কিন্তু একদিন গ্রামেরই এক মহিলা তার হারানো ছাগল খুঁজতে এদিকে চলে আসে, তারপর দু'দিন তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সবাই ভেবে নিয়েছিল যে আগের দু'জনের মতো এরও সেই একই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু দু'দিন পর এই মহিলা নিজেই গ্রামে ফিরে আসে। তখন নাকি সে আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, অনেক জিজ্ঞাসা করেও তার কাছ থেকে কিছু জানতে

পারা যায়নি। চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকে আর বিড়বিড় করে নিজের মনেই কীসব বলে। কোনও উপায় না দেখে আবার সেই জানগুরুকে ডেকে আনা হয়। সে এসে সমস্ত দেখে বলে যে ওই মহিলাটির উপরে নাকি বিশাইয়ের হাওয়া লেগেছে। অনেক ঝাড়ফুঁক করেও নাকি কোনও কাজ হয়নি। মহিলাটি এখন ঘরের মধ্যে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে, নিজের মনেই বিড়বিড় করে কীসব বকে। মাঝে মধ্যে ওর উপর বিশাইয়ের ভর হয়। তখন ওকে বেঁধে রাখতে হয় দড়ি দিয়ে, নাহলে জ্যান্ত হাঁস মুরগি ছাগল ভেড়া যা হাতের কাছে পায় তাই ধরে কামড়ে ছিড়ে ছিড়ে খায়। ওই মহিলার ওরকম বীভৎস পরিণতি দেখে গ্রামের লোকেরা ভয়ে আর কেউ এই জঙ্গলের ধার মাড়ায় না।

তারপর বহুদিন সব ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু ইদানিং একটা নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝেই গ্রাম থেকে হাঁস মুরগি ছাগল ভেড়া মোষের বা গরুর বাছুর হারিয়ে যায়। খোঁজাখুঁজি করলে জঙ্গলের ভিতরে তাদের ছেঁড়াখোঁড়া দেহাবশেষ পাওয়া যায় অবশ্য। কিন্তু এসবের পিছনে জঙ্গলের কোনও হিংস্র প্রাণী নাকি বিশাই রয়েছে তা জানতে পারা যায়নি। এই তো, গতকাল রাত্রেও শংকরদের গোয়াল থেকে একটা মোষের বাছুরকে কোনও কিছুতে টেনে নিয়ে গেছে। ওরা সে সময় জেগেই ছিল কিন্তু বিশাইয়ের ভয়ে কেউ বাইরে বেরোতে পারেনি। সকাল হতে সবাই মিলে দলবেঁধে বাছুরটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

এতক্ষণে কাল রাতের সেই রক্তমাখা হাড়ের টুকরোর রহস্যটা বুঝতে পারলাম। বিশাই গ্রাম থেকে মোষের বাছুরটাকে শিকার করে নিয়ে এসে জঙ্গলবাড়ির পিছনে বসে আয়েস করে খাওয়ার তাল করেছিল। কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যেতেই বিরক্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখানোর জন্য হাড়ের টুকরোটা ছুঁড়ে মারে। এইবার ওর রাগের কারণটা স্পষ্ট হলো।

শিবু আর শংকরের হাত ধরে ওদেরকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গেলাম। ওদের আমি বহুদিন ধরে চিনি, এই পরিস্থিতিতে ওদেরই যা একটু ভরসা করতে পারি। আমি জঙ্গলবাড়িতে আসার

পর থেকে কাল রাতের সমস্ত ঘটনার কথা ওদের কাছে খুলে বললাম। সব শুনে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। শংকর চোখগুলো বড় বড় করে বলল, "পণ্ডিত, তুই বেঁচে গেলিস কী করে! বিশাই ট তুকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলো?"

আমি হেসে বললাম, "আমি বিশাইয়ের মন্ত্র জানি, বিশাই আমার কিছু করতে পারবে না। তবে তোরা যদি আমাকে সাহায্য করিস তাহলে বিশাইকে আমি চিরদিনের জন্য এই জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব। তোদের গ্রামের ওই মেয়েটাকেও আমি সারিয়ে তুলব।"

শিবু হাঁ করে শুনছিল আমার কথা। বলল, "আমাদের জানগুরু পারলেক নাই, আর তুই বিশাই টকে খেদাড়্যে দিবি?"

বললাম, "সেজন্যই তো এতদিন পর ফিরে এসেছি। এবার তোরা ঠিক কর আমাকে সাহায্য করবি কিনা।"

শিবু ওর দলের কাছে ফিরে গিয়ে আদিবাসী ভাষায় কিছু বলতেই সবাই ওকে ঘিরে ধরল। ওদের ভাষা আমি একটু একটু বুঝতে পারি। ওদের কথা শুনে বুঝলাম শিবুর কথায় ওরা বিশ্বাস করতে চাইছে না। আর আমি 'দিকু' মানে আদিবাসী নই তাই আমার কথা শুনলে ঝামেলা বাড়তেও পারে। শিবু অনেক কষ্টে ওদের বোঝাতে সক্ষম হলো যে আমি যখন ওই জঙ্গলবাড়িতে রাত কাটাতে পেরেছি তখন আমার কথা বিশ্বাস করাই যায়।

বেশ কিছুক্ষণ চাপান উতরের পর ওরা নিমরাজি হলো দেখে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ওদের কাছে গেলাম। তারপর সবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হলো আমি শিবুকে নিয়ে ঝালদা চলে যাব। আমার প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র আর খাবার-দাবার সব কিনে নিয়ে আসতে হবে। শংকর এবং দলের বাকিরা ততক্ষণ আমার ওই বাড়িতে গিয়ে টোকেন মুর্মুর সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করবে, কুয়ো ঝালাই করবে আর ঘরদোর সব যতটা সম্ভব ঝেড়েঝুড়ে সাফ করে রাখবে। আমরা ঝালদা থেকে ফিরলে সবাই মিলে একসঙ্গে ওদের গ্রামে যাব ওই অসুস্থ মহিলাটিকে দেখতে। তারপর গ্রামবুড়োদের

সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে। শংকরকে সমস্ত কিছু ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে ওদের জঙ্গলবাড়ির দিকে রওয়ানা করিয়ে দিলাম। তারপর শিবুকে বাইকের পিছনে বসিয়ে বাইক ছুটিয়ে দিলাম ঝালদার উদ্দেশে।

১২

ঝালদায় পৌঁছে প্রথমেই রাঁচি রোডের ওদিকে আমার গ্যারেজে গেলাম। এখন অবশ্য আর আমার গ্যারেজ বলা যায় না। স্বরূপ নামের একটি ছেলে এখন এটা চালায়। স্বরূপ আগে আমার গ্যারেজেই কাজ করত, আমিই ওকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছিলাম। এখনও আমাকে বড় দাদার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ঝালদা ছেড়ে যাবার সময় আমার জঙ্গলবাড়ির চাবি এবং গ্যারেজের সমস্ত দায়িত্ব ওকেই দিয়ে গিয়েছিলাম। ও সেই সব দিনের কথা আজও ভোলেনি। শিবুদের কাঁড়বাঁধি গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরেই বাহিদ্যা নামের একটা গ্রামে স্বরূপের বাড়ি। প্রতিদিন গ্রাম থেকেই ঝালদার এই গ্যারেজে ও যাতায়াত করে থাকে।

গতকাল সকালে আমি যখন ঝালদায় আসি তখনই ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি জঙ্গলবাড়িতে থাকার জন্য ফিরে এসেছি শুনে ও ভীষণ অবাক হয়েছিল। আমাকে অনেক বুঝিয়েছিল ওই জঙ্গলে আর ফিরে না যেতে। কিন্তু আমি ওর কথা না শোনায় ও নিজেই আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। আমি ওকে বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, প্রয়োজন পড়লে নিশ্চয়ই ওর থেকে সাহায্য নেব।

স্বরূপ গ্যারেজেই ছিল, আমাকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে বেরিয়ে এলো। আমাকে অক্ষত দেখে ও যেমন অবাক হলো তেমনই খুশিও কম হলো না। শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে ও আমাদের গ্যারেজের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর হাঁকডাক করে কর্মচারি ছেলেটাকে আমাদের জন্য চা

আনতে পাঠিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, "তাহলে কী ঠিক করলে দাদা? ওই জঙ্গলে থাকার কি কোনও দরকার আছে? তুমি তো আমার গ্রামের বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারো। আবার একসঙ্গে দু'জনে মিলে গ্যারেজ চালাব।"

"না রে ভাই, গ্যারেজ করতে তো আমি আসিনি। এই সব কিছু এখন তোর, নিজের পরিশ্রমে তুই গ্যারেজটাকে দাঁড় করিয়েছিস।" স্বরূপের কথার উত্তরে আমি বললাম, "যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই তোকে জানাব। কিন্তু এখন আমার উদ্দেশ্য আলাদা।"

স্বরূপ আমার কথায় একটু দুঃখ পেয়ে বলল, "তোমাকে বারণ করলে তো শুনবে না দাদা। কাল যখনই এসে বললে যে তুমি আবার ওই বাড়িতে ফিরে যাবে, তখুনি বুঝেছি যে তুমি এবারেও একটা ঝামেলা পাকাবে। কী দরকার ওসব হুজ্জোতের মধ্যে যাওয়ার?"

স্বরূপের কথায় আমি হেসে ফেললাম। ওকে বোঝানো সম্ভব নয়, ও যে আমাকে ভালোবাসে। আর যারা ভালোবাসে তারা কোনও যুক্তি বুদ্ধিই মানে না, মানতে চায় না।

এমন সময় গ্যারেজের কর্মচারিটা চা নিয়ে আসায় আমাদের আলোচনা বন্ধ করতে হলো। চায়ের একটা কাপ তুলে নিয়ে আমি বললাম, "তুই বেকার চিন্তা করছিস ভাই। বাড়িটা ওভাবে ফেলে রেখেও তো কোনও লাভ নেই। ওটা আমি বিক্রি করে দিতেও পারব না। মাঝেমধ্যে এসে কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে যাব।"

স্বরূপ মাথা নেড়ে বলল, "তোমাকে আমি ভালোই চিনি দাদা। ছুটি কাটানোর জন্য তুমি এখানে আসোনি। তোমার উদ্দেশ্যটা কী?"

"উদ্দেশ্য একটা আছে, তবে সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। আগে ক'টা দিন ওখানে থাকি, তারপর যদি বুঝতে পারি তখন তোকে নিশ্চয়ই সেটা জানাব।"

আমার কথা শুনে স্বরূপ গম্ভীর মুখে বলল, "আমি জানি তুমি আমাকে খুলে বলবে না। তবে তোমার আসার কারণটা আমি

আন্দাজ করতে পারছি।" বলতে বলতে ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। উঠে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল, "যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে দাদা। ওই ভুতুড়ে বাড়িটা এতগুলো মানুষের জীবন খেয়ে নিলো। তুমি কেন শুধু শুধু এতটা রিস্ক নিতে চাইছ?"

"এখুনি সবকিছু জানতে চাস না স্বরূপ। সময় হলে আমি নিজেই তোকে সবকিছু জানাব।" বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "আজ কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারব না ভাই। বুঝতেই পারছিস জঙ্গলে নতুন সংসার পাততে এসেছি, বাজারে গিয়ে অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেল। এইবার না বেরোলে দুপুরের আগে জঙ্গলবাড়িতে ফিরতে পারব না।"

স্বরূপ হেসে বলল, "তোমাকে আর কিছুই কেনাকাটা করতে হবে না, সব আমি করে রেখেছি। জানি তো যে তোমার মাথায় যখন পাগলামি চেপেছে তখন তুমি আর কারওর কোনও কথাই শুনবে না।" বলে বাইরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, "ওই দেখো।"

দেখি গ্যারেজের পাশে বড় কদম গাছটার নীচে একটা জিপ দাঁড় করানো আছে। স্বরূপ হাসতে হাসতে বলল, "বাইকটা এখানেই রেখে দিয়ে যাও দাদা, জিপটা সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমারই সুবিধে হবে। ওতে একমাসের মতো চাল ডাল তেল মশলা কিনে রেখে দিয়েছি। কিছু সবজিও দেওয়া আছে। হন্ডার পোর্টেবল জেনারেটারটাও চাপিয়ে দিচ্ছি। ওই ভুতুড়ে বাড়িতে অন্ধকারে থাকতে হবে না। আরও কিছু লাগলে বলো, আমি এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।"

"আরে এ কী করেছিস তুই!" স্বরূপের কাণ্ড দেখে আমার চোখ কপালে উঠল।

স্বরূপ হাসতে হাসতে বলল, "আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম যে তুমি যখন ফিরে এসেছ তখন এত সহজে জঙ্গল থেকে নড়বে না। সেজন্য আজ সকালেই এসব বাজার করে রেখেছি। তুমি এখানে না এলে আমি নিজেই গিয়ে ওগুলো দিয়ে

আসতাম।"

স্বরূপের কাণ্ড দেখে আমার চোখে জল চলে এলো, এত ভালোবাসা সত্যিই আমি আশা করিনি। ওকে যখন গ্যারেজে এনেছিলাম তখন ওর কতই বা বয়েস হবে, তেরো চোদ্দ বছর। তুলিনের একটা ট্রাকের ডিপোতে ক্লিনারের কাজ করছিল। বাবা-মা নেই, অনাথ ছেলে। মামাবাড়িতে অনাদরে বড় হয়েছে। লেখাপড়া ওই প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত, তারপর আর এগোতে পারেনি। গ্যারেজে নিয়ে আসার পর রাতদিন এখানেই পড়ে থাকত, কাজ শেখার খুব আগ্রহ ছিল ওর। ওকে আমি নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতাম। বলেছিলাম, স্কুলে ভর্তি হয়ে যা আমি তোকে পড়াব। কিন্তু কিছুতেই স্কুলে যেতে চায়নি। শুধু বলত, লেখাপড়া ওর দ্বারা হবে না, ও গ্যারেজে থেকেই কাজ শিখবে। আমি জিজ্ঞেস করতাম, এত খেটে কী করবি? ও বলত, নিজের বাড়ি বানাব। আমরা মজা পেতাম ওর কথা শুনে। আজ সেই ছেলেটাই কত বড় হয়ে গেল। হয়তো বিরাট বড়লোক হতে পারেনি, কিন্তু খুব বড় মনের মানুষ যে হতে পেরেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গ্রামে জায়গা কিনে নিজের জন্য একটা বাড়িও বানিয়েছে স্বরূপ, ওর সেই স্বপ্নের বাড়ি। শান্তিতে থাকার জন্য এর থেকে বেশি আর কী চাই? ও আমার ভালোবাসা এখনও মনে রেখেছে দেখে বড় আনন্দ পেলাম। ভালোবাসার কদর আজকাল আর কেউ করে না। সবাই খুব সহজেই সব কিছু ভুলে যেতে পারে। খুব কম মানুষই আছে যারা ভালোবাসার কদর বোঝে, সম্পর্কের মূল্য বোঝে। স্বরূপের সামনে বসে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল। আজকাল নিজের ভাইও হয়তো এতটা করে না।

বললাম, "তুই আবার কেনাকাটা করতে গেলি কেন রে ভাই?" ওকে জিনিসপত্রের দাম হিসেবে কিছু টাকা দিতে গেলাম কিন্তু ও নিলো না।

হাতজোড় করে বলল, "তোমার কাছে এটুকুর জন্য টাকা নেব দাদা?" ওর চোখ ছলছল করে উঠল। "তুমি তোমার গ্যারেজ এক কথায় আমাকে ছেড়ে দিলে, আজও অব্দি এক টাকাও নিলে

নয় তার জন্য। তোমার জন্যই আজ করে খেতে পারছি। এসব তো তোমারই জিনিস দাদা। ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো, আবার দু' ভাইয়ে মিলে গ্যারেজ চালাব।"

স্বরূপকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম, কিছু বলার মতো ভাষা আমার ছিল না। এরকম মানুষও আছে পৃথিবীতে! আজকের দিনে ভাই ভাইয়ের কথা মনে রাখে না। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে মনে হলো যেন গঙ্গাস্নান করে উঠলাম। হায়রে স্বার্থপর দুনিয়া! নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মূল্য বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই।

সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে জিপে রেখে যখন স্বরূপের গ্যারেজ থেকে বেরোলাম তখন প্রায় বারোটা বেজে গেছে। ফিরতে ফিরতে আরও ঘন্টা খানেক লেগে যাবে। ফিরে গিয়ে আর রান্না করা যাবে না, তার থেকে খাবার কিনে নিয়ে গেলেই সব থেকে ভালো হবে। রাস্তার পাশের একটা হোটেল থেকে সবার জন্য মাছ ভাত সবজি কিনে নিলাম। শিবুকে বললাম খেয়ে নিতে কিন্তু ও একা খেতে চাইল না। বলল ফিরে গিয়ে আমাদের সবার সঙ্গেই খাবে।

অনেকদিন পর স্টিয়ারিং-এ বসে খুব ভালো লাগছিল, এদিকের রাস্তাঘাটও বেশ ভালো। রাস্তার দু'পাশের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে ড্রাইভ করছিলাম। শিবু পিছনের সিটে মুখ গোমড়া করে বসেছিল, বারবার বলাতেও কিছুতেই আমার পাশে এসে বসল না। ওর মনখারাপের কারণ খুব সামান্য, আজ রাতে ওদের গ্রামে 'খাটি' মানে ফিস্ট হবে এবং ওর খুব ইচ্ছে আমি রাতটা ওদের সঙ্গে গ্রামেই কাটাই। মুরগি মহুয়ার দেদারও বন্দোবস্ত রয়েছে, সারারাত নাচগানও হবে। আমি যাব না বলাতে অভিমান হয়েছে ওর। বেশ ছেলে এই শিবু, বাবা মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। বিয়ে একটা করেছিল কিন্তু সেটা টেকেনি, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আগে ওই পাথর খাদানে লেবারের কাজ করত, এখন ইটভাটায় ট্রাকটার চালায়।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম,

"কি রে, চুপ করে আছিস কেন? তোদের খাঁটে যাব না বলে রাগ করেছিস নাকি?"

শিবু মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, "সে তু যাবি কেনে পণ্ডিত, হড় ঘরে খাল্যে তুর জাত যাবে যে।"

"কী বললি তুই? তোদের ঘরে খেলে আমার জাত চলে যাবে!" শিবুর কথায় আমার রাগ হলো। বললাম, "হ্যাঁ রে শিবু, আজ আমি দিকু হয়ে গেলাম— বল? এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন তোর বাড়িতে কতদিন খেয়েছি— ভুলে গেছিস? একসঙ্গে জঙ্গলে শিকারে গেছি, মহুয়া আর ছাতু কুড়িয়ে বেড়িয়েছি গোর্গাবুরুর নীচের ডুংরিতে। আর আজ তুই বলছিস জাতের কথা!"

শিবু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "থালে আজও চল, ফির একবার আমাদের সঙ্গে থাকবি হড় হয়ে। কত মজা করব্য সবাই মিলে।"

সামনে একটা বাঁকের পর বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে নেমে যেতে হবে, সোজা রাস্তাটা বাঘমুণ্ডি চলে যাচ্ছে। স্পিড কমিয়ে পিচ রোড থেকে জঙ্গলের রাস্তায় জিপটা নামিয়ে নিয়ে বললাম, "আজ তো তোদের গ্রামে যাবই, তবে রাতে ওখানে থাকা হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি বলিস তো রাতে খাওয়া-দাওয়া করেই নাহয় জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যাব।"

শিবু কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল। পিছনে থাকায় ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না তবে বুঝতে পারছি আমার এই প্রস্তাবটাও ওর পছন্দ হলো না। রাত্রে আমার ওই জঙ্গলবাড়িতে থাকাটাই ওর পছন্দ হচ্ছে না। সে আর কী করা যাবে। ওকে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই ও রেগে আছে, এখন কিছুই শুনতে চাইবে না।

শিবু আমার অনেক পুরোনো বন্ধু। একসঙ্গে জঙ্গল পাহাড় চষে বেড়িয়েছি এক সময়। বহুদিন পরে আমাকে পেয়ে ও ভেবেছিল আবার আগের মতো হইহুল্লোড় হবে। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি আর নেই। এই বিশাইয়ের একটা বন্দোবস্ত না করা পর্যন্ত আমি কোনও উৎসবেই অংশগ্রহণ করতে পারব না। জানি না কেন শিবু আজ জাত তুলে কথা বলল। হয়তো অভিমানে বলে

ফেলেছে। আমি কবে জাতের পরোয়া করেছি! আদিবাসী হলেও এদের মধ্যে যা শিক্ষা সংস্কার আছে তা অনেক সভ্য জাতির মধ্যেও নেই। এত সহজ সরল মানুষ বলেই ওদের ঠকিয়ে দিনের পর দিন বোকা বানিয়ে রেখে সুসভ্য মানুষেরা রাজনীতি করে এসেছে এবং এখনও করছে। এরা যদি কাউকে বিশ্বাস করে, তবে তার জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিতেও পিছপা হয় না। সেই ছোট থেকে আদিবাসী সাঁওতালদের সঙ্গে ওঠাবসা করছি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি থেকে জানি যে এদের মতো এত সরল এবং বিশ্বাসী জাতি আজকের দিনে সত্যিই বড় বিরল।

শিবু চুপ করে আছে দেখে আমিও চুপচাপ ড্রাইভ করছিলাম। জঙ্গলের রাস্তাটা কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে যেতেই পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা শুরু হয়ে গেল। সামনে কাছিমের পিঠের মতো একটা বিরাট প্রান্তর পুরো ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে কোনও গাছপালা হয়নি কোনও দিন। এদিক ওদিক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বড় বড় পাথরের টুকরো আর বুনো খেজুরের ঝোপ ছাড়া সেই ফাঁকা মাঠে আর কিছু নেই। মাঠের শেষের দিকটা ঢাল হয়ে নেমে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর আবার চড়াই হয়ে উঠেছে। চড়াইটা উঠেই আবার কয়েক মাইল জুড়ে ফাঁকা মাঠ, মাঠের শেষে আবার জঙ্গল শুরু। ওই জঙ্গলের ভিতর কিছুটা গিয়েই শিবুদের গ্রাম কাঁড়বাঁধি।

বেলা পড়ে আসছে তাই যতটা সম্ভব জোরেই ড্রাইভ করছিলাম। শিবুদের গ্রামটা বাঁয়ে রেখে সোজা জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা গিয়ে আবার একটা ঢালের পর যেখানে চড়াইটা শুরু হচ্ছে সেখানেই কুখ্যাত পাথর খাদানটা। খাদানটার ওদিকে গাছপালা তেমন নেই, শুধু ফাঁকা মাঠের মধ্যে এদিক ওদিকে ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা প্রাচীন শাল আর মহুয়ার গাছ পাহাড় জঙ্গলের পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠটা পেরিয়ে কিছুদূর গেলে আদিবাসীদের 'কুদরুম' চাষের ঢালু জমি। তারই অল্প দূরে আমার জঙ্গলবাড়িটা নিজের চারিদিকে রহস্যের জাল বুনে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলবাড়ির পিছন থেকেই মূল জঙ্গলের শুরু।

সেটা পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে সোজা অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে।

জিপটা এনে সত্যিই খুব উপকার হয়েছে দেখছি। এই পাহাড় জঙ্গলে চলার জন্য জিপের থেকে ভালো আর কিছু হয় না। স্বপন বুদ্ধি করেই জিপটা দিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া বাইকে এত মালপত্র বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হতো না। দেখতে দেখতে আমরা পাথর খাদানটা ছাড়িয়ে জঙ্গলবাড়ির কাছে এসে পড়লাম। বাইরের বড় গেটটা দিয়ে ঢোকার সময় শংকরকে দেখতে পেলাম। টোকেন মুর্মু এবং অন্যানাদের নিয়ে বাইরের ঝুপসি আমগাছটার নীচে বসে বিশ্রাম করছে। এরই মধ্যে সবাই মিলে বাড়িটার আশেপাশের ঝোপজঙ্গল প্রায় সাফ করে ফেলেছে। জিপটা দাঁড় করিয়ে নেমে দাঁড়াতেই কুকুরটা ডাক ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এলো। একরাতের মধ্যেই আমাকে বেশ চিনে গেছে দেখছি। ভাঙা পা-টা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে দেখে নজরে পড়ল ওর পায়ের ব্যান্ডেজটা নতুন করে বাঁধা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই শংকরের কাজ। ওর বাবা হাড়মা মান্ডি জঙ্গলের শেকড়বাকড় গাছগাছড়া থেকে ওষুধ বানায়। ও নিজেও বাপের কাছে সেই বিদ্যা শিখেছে। গতবার এখানে থাকার সময় আমার পা মচকে যাওয়াতে হাড়মা মান্ডি এসে পাতা আর শেকড় বেটে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিল। তখন ওই ওষুধটা আমি শিখে নিয়েছিলাম। আমি কুকুরটার সামনে ঝুঁকে পায়ের ব্যান্ডেজটা লক্ষ করলাম। যা ভেবেছি তাই, এ তো একদম পাকা হাতের কাজ! বাঁশের ছোট ছোট বাতা দিয়ে টাইট করে বাঁধা, দু'দিনেই সেরে যাবে পা-টা। কুকুরটা খুশিতে জিভ বার করে লেজ নেড়ে লাফ দিতে শুরু করল।

শংকর আর অন্যরাও এগিয়ে এলো, আমাদের দেখে। শিবুকে বললাম খাবারের প্যাকেটগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলতে। বাকি মালগুলো পরে নামালেও চলবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে, এখন আগে হাত-পা ধুয়ে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে হবে।

শংকর আমাকে কিছু বলার জন্য উসখুস করছিল। ওর ইতস্তত ভাব লক্ষ করে ইশারায় ওকে বললাম আগে খাওয়া-দাওয়া হোক, তারপর কথা হবে। শংকরের থমথমে মুখ দেখে

মনে হলো ওর অনেক কিছুই বলার আছে। অবশ্য আমিও ওর কাছে অনেক কিছুই শুনতে চাই। আমি জানি ও নিশ্চয়ই কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়েছে।

১৩

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। উঠোনের বড় আমগাছটার নীচে বসে সবাই একসঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করলাম। কুকুরটাও আমাদের সঙ্গে বসেই খেলো। বড় ভালো স্বভাবের কুকুর, কিন্তু এই জঙ্গলে ও কোথা থেকে এলো সেই প্রশ্নের জবাবটা আর পাওয়া হলো না। শিবু, শংকর বা টোকেন মুর্মুরা জানাল যে ওরাও এই কুকুরটাকে এর আগে কখনও দেখেনি। শংকর বলল, "আরে পণ্ডিত, আমি তো ভাবলি যে তুর পুষা কুকুর। খুঁড়া হইছে দিখে হাড়জড়ির পাতা তুলে পা-ট বেন্ধে দিলম। গিঁটের হাড় ট খুলে গেছিল।"

সেটা আমিও কাল রাত্রেই খেয়াল করেছিলাম, কুকুরটার ডানপায়ের থাবার গাঁট সরে গিয়েছিল। যাই হোক, শংকরের পাকা হাতের বাঁধুনিতে ওর পায়ের হাড় খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। কুকুরটা যখন আমার কাছেই থাকছে তখন ওর একটা নাম রাখা দরকার। মনে মনে ঠিক করলাম, ওর নাম রাখব ভৈরব। এই নামে আমার আগেও একটা পোষা কুকুর ছিল ঝালদাতে। বেচারা ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। ওকে আমি ভুলতে পারিনি এখনও, তাই ওর নামটাই থাক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমগাছের নীচে বড় চ্যাটালো পাথরটার উপর বসে পড়লাম। শিবু আর টোকেন মুর্মু এঁটো পাতাগুলো তুলে নিয়ে বাউন্ডারির বাইরে ফেলে দিয়ে এলো। নাহলে জোরে হাওয়া দিলে পাতাগুলো উড়ে এসে ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। ভৈরব আমার পাশেই মাটিতে শুয়ে চারিদিকে নজর রাখছিল। ভরপেট মাছ ভাত খেয়ে ওর মেজাজটাও ঠন্ডা হয়েছে মনে হলো। কাল রাতের সেই আতঙ্কটা ও কাটিয়ে উঠেছে দেখে

খুশি হলাম। এমন সময় শংকর হাতমুখ ধুয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মুখ দেখে মনে হলো ও কিছু একটা বলার জন্য মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে। ইশারায় ওকে বসতে বললাম। ও বসল না, চট করে চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "পণ্ডিত, কাল রাতে ইখানে কী হইছিল সুত্যি করে বল। আমি জানি উ বিশাই ট জরুর কাল রাতে ইখানে আইছিল।"

শংকর সারাদিন সাফাইয়ের কাজ করেছে এই বাড়িতে। হয়তো কালকের সেই হাড়ের টুকরোটা কোনও ভাবে ওর চোখে পড়েছে। বললাম, "কেন রে, কিছু দেখতে পেয়েছিস নাকি?"

শংকর কাঁধের গামছাটা মাটিতে বিছিয়ে বসে পড়ে বলল, "একবার ঘরটার পিছন দিকে ঘুরে দেখি আয়, আমাদের মুখের বাছুরটাকে উখানেই মার্যে খাইছে বিশাই ট।"

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। "কেন, ঘরটার পিছন দিকে কী হয়েছে?"

শংকর জানাল ঝোপঝাড় কাটতে কাটতে ও বাড়িটার পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। সেখানেই একটা ঝোপের মধ্যে ও বাছুরটার ছেঁড়াখোঁড়া শরীর পড়ে থাকতে দেখতে পায়। ও এই নিয়ে কাউকে কিছু বলেনি কারণ তাহলে সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত। সেজন্য মৃত বাছুরটাকে একটা বস্তা চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আমি যদি বলি তাহলে জঙ্গলের মধ্যেই গর্ত খুঁড়ে বাছুরটাকে পুঁতে দেবে। তবে তার আগে বাকি সবাইকে এখান থেকে বিদায় করতে হবে, নাহলে একবার যদি খবরটা ছড়িয়ে যায় তাহলে খুব খারাপ ব্যাপার হবে। আমি নিজেও আদিবাসীদের চোখে খারাপ হয়ে যাব। ভেবে দেখলাম, শংকরের কথায় যুক্তি আছে। কারণ আমি আসার পরই জঙ্গলবাড়ি থেকে বাছুরটার লাশ পাওয়া গেছে, হয়তো ওরা আমাকেই বিশাই বলে ধরে নেবে। আর সেটা হলে আমার এখানে থাকাটাও বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে এসেছি তাতে প্রতিপদে আমাকে জঙ্গলের আদিবাসীদের সাহায্য নিতে হবে। ওরা যদি আমাকে ভয় পায় বা আমাকে শত্রু মনে

করে তাহলে ভীষণ সমস্যায় পড়ে যাব।

একটু ভেবে নিয়ে আমি বললাম, "ঠিক আছে, তোরা তাহলে মালপত্রগুলো ঘরে ঢুকিয়ে দে। আর কয়েক জনকে বল জঙ্গল থেকে কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করে আনতে। আজকে আর অন্য কিছু করতে হবে না। বাকি কাজ কাল সকালে এসে করবি নাহয়।"

শংকর আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উঠে পড়ল। তারপর গামছাটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে গেল ওর দলের লোকদের দিকে। দলের বাকিরা তখন শালপাতায় দোক্তা মুড়ে 'চুটি' পাকিয়ে খাওয়ার জোগাড় করছিল কুয়োর বাঁধানো চাতালে বসে। শংকর গিয়ে ওদের কিছু বলতেই ওরা কয়েক জন টাঙ্গি নিয়ে কাঠের জোগাড়ে বেরিয়ে পড়ল। শিবু শংকর এবং বাকিরা জিপ থেকে মালগুলো নামিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগল ঘরের মধ্যে।

ওরা বাড়িটার সামনের দিকের ঝোপঝাড় মোটামুটি পরিষ্কার করে ফেলেছিল। বাকি রয়েছে শুধু বাড়ির পিছনের দিকটা। আর কুয়োটা একবার ঝালাই করে নিতেই হবে। আজ তো সন্ধ্যাবেলায় শিবুদের গ্রামে যাচ্ছিই, প্রয়োজনীয় পানীয় জল ওখান থেকেই নিয়ে আসতে পারব। কিন্তু প্রতিদিন জল বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কুয়োটা ঝালাই করে নিলে অবশ্য আর কোনও সমস্যা থাকবে না। এছাড়াও ঘরের ছাদ আর অন্য ঘরগুলোর ভিতরের ধুলো ময়লা সব ওই একই সঙ্গে পরিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। আজ আর হবে না, আগামীকাল সকালে ওরা কয়েক জন এসে সেই ব্যবস্থাই করবে। কাল সকালে আর একবার সবাই মিলে লেগে পড়লেই বাড়িটা বসবাসের উপযোগী হয়ে যাবে। শিবুকে ডেকে বললাম সবাই মিলে ধরাধরি করে জেনারেটরটাকে বারান্দায় তুলে রাখতে। তারপর ইশারায় শংকরকে ডেকে নিয়ে বাড়িটার পিছন দিকে গেলাম।

দেখলাম শংকর ঠিকই বলেছিল, পিছন দিকের সিমেন্টের চাতালে কয়েক জায়গায় এখনও চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। চাতালের নীচে মাটিতে স্পষ্ট ঘষটানোর দাগ। কোনও

ভারি কিছু মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে যেমন দাগ হয়— ঠিক তেমন। এদিকটায় সিঁয়াকুল গাছের জঙ্গল হয়ে গেছে একেবারে। সিঁয়াকুলের ভয়ংকর কাঁটার জন্য ঝোপের মধ্যে বেশিদুর এগোনো গেল না। শংকর ওদিকে দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখছিল যাতে কেউ এদিকে আসতে না পারে। অবশ্য ভৈরবকে আটকানো যায়নি, ও আমার সঙ্গেই চলে এসেছিল। কিন্তু কেন জানি না সিমেন্টের দাওয়াটা থেকে এদিকে নেমে এলো না। দাওয়াটার পুব দিকে একটা পায়খানার চেম্বার আছে, যদিও ওটা ব্যবহার হয়নি কখনও। ঘরের ভিতরে একটা অ্যাটাচ টয়লেট বানানোর জন্য এদিকে ওই নতুন চেম্বারটা বানানো হয়েছিল। দশ বাই পনেরো ফুটের বিরাট চেম্বার। উপরটা ঢালাই করা আর তাতে ম্যানহোলের ঢাকনার মতো দুটো লোহার ঢাকনা লাগানো। ভৈরব ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে 'গররররর গররররর' করে গর্জন করছিল। সন্দেহ হতে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম চেম্বারের একটা ঢাকনা নেই, আর ওই খোলামুখের দিকে তাকিয়ে ভৈরব রাগে গর্জন করছে। চেম্বারের ভিতরটা নিকষ অন্ধকারে ঢাকা। ভিতরের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু ভৈরবের গর্জন ওই চেম্বারের ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছিল। ওকে টেনে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এলাম। কী জানি, রাগের মাথায় যদি ওই চেম্বারের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে ওকে বার করতে চেম্বারটাই হয়তো ভাঙতে হবে।

এদিকে শিবু আর বাকিরা মিলে ততক্ষণে মালপত্র সব গুছিয়ে রেখে ফেলেছে। যারা জঙ্গলে কাঠ আনতে গেছে তারা তখনও ফেরেনি। আমি ভৈরবকে শংকরের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি জেনারেটরটা রেডি করে ফেললাম। আগে যখন পাথর খাদান চালু ছিল তখন এই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। স্বরূপ বুদ্ধি করে কয়েকটা এলইডি বাল্বও দিয়েছে। সেগুলো হোল্ডারে লাগিয়ে দিয়ে জেনারেটর স্টার্ট করে দেখলাম সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে। যাক, তাহলে রাত্রিবেলায় আর মোমবাতি জ্বেলে

কাজ করতে হবে না। সঙ্গে জোরালো আলো থাকলে এই দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে আলাদা একটা বল ভরসা পাওয়া যায়।

টোকেন মুর্মু আর বাকিদের মজুরি বুঝিয়ে দিতে ওরা খুশি হয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল। কাল সকালে ওদের আবার আসতে হবে, এখনও অনেক কাজ বাকি থেকে গেল। ওদের বলে দিলাম, শিবু আর শংকর আমার সঙ্গেই গ্রামে ফিরে যাবে। গ্রামে গিয়ে ওদের বাড়িতে যেন খবরটা ওরা জানিয়ে দেয়।

ওরা চলে যাবার পর শংকর টাঙ্গি নিয়ে কাঠ কাটতে শুরু করল। ছেলেগুলো অনেক কাঠ এনে দিয়ে গেছে। কাঠগুলো চালা করে তিনজনে মিলে ঘরের পিছনে সেই ঝোপের কাছে বয়ে নিয়ে গেলাম। ছোট একটা চিতা মতো সাজিয়ে নিয়ে শিবু দেশলাই জ্বেলে সেই কাঠের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিতেই শুকনো শাল কাঠ 'পট পট' শব্দ করে জ্বলে উঠল। শংকর ঝোপের আড়াল থেকে সেই মোষের বাছুরের লাশটা বার করে নিয়ে আসতে সেটা দেখে আঁতকে উঠলাম। উফফফ, কি বীভৎস দৃশ্য!

বাছুরটার সারা শরীরে এখানে ওখানে গভীর গর্ত, কেউ যেন খুব আক্রোশের সঙ্গে ছিড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে! গলা বুক এবং পেটের অংশে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শংকর বাছুরটাকে আগুনের উপর চাপিয়ে শুকনো কাঠ চাপা দিয়ে দিতে পাক দিয়ে ওঠা ধোঁয়ার সঙ্গে মাংস পোড়ার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসটা একেবারে ভারি করে দিলো। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অবশ্য পাহাড় জঙ্গলে সন্ধ্যের অন্ধকার একটু তাড়াতাড়িই নেমে আসে। দিনের বেলায় যদিও সব কিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল কিন্তু এখন রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই পুরো জঙ্গলটা যেন আবার ধীরে ধীরে সেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হতে শুরু করেছে। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে দেখে শিবু আর শংকরও গ্রামে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা ভয় পাচ্ছে দেখে আমি ওদের আশ্বস্ত করলাম।

বাছুরটার শরীরে আর তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে শিবুদের গ্রামের উদ্দেশে যখন বেরোলাম তখন জঙ্গলে

অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। শিবু আর শংকর যথারীতি জিপের পিছনে চেপে বসল, সামনে আমি আর ভৈরব। ভৈরবকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই অভিশপ্ত বাড়িতে কোনও জীবিত প্রাণীকে রেখে যাওয়ার ঝুঁকি আমি আর কিছুতেই নিতে পারব না।

জিপটা স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিয়ে যখন গেটের কাছে পৌঁছেছি ঠিক তখনই এক প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ ভেসে এলো বাড়িটার দিক থেকে। সেই ভয়ংকর গর্জনের শব্দে যেন সমস্ত জঙ্গল পাহাড় থরথর করে কেঁপে উঠল! ভীষণ চমকে উঠে আর একটু হলেই রাস্তার পাশে একটা গাছে ধাক্কা মেরে ফেলতাম। নেহাত পুরোনো ড্রাইভার তাই কোনও রকমে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে ধাক্কাটা এড়াতে পারলাম। পিছন থেকে শিবু আর শংকর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, "জোরে চালা পণ্ডিত, ধরে ফেলল রে!"

কেন জোরে চালাব? কে ধরে ফেলবে আমাদের! এসব প্রশ্নের সময় তখন ছিল না। এদিকে ভৈরব লাফ দিয়ে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে রাগে 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে শুরু করেছে, আর ওদিকে পিছন থেকে শিবু আর শংকরের পরিত্রাহি আর্তচিৎকার! প্রাথমিক স্তম্ভনভাবটা কাটিয়ে উঠেই ঝড়ের বেগে জিপটাকে ছোটাতে শুরু করলাম গ্রামের দিকে। পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তবু যতটা সম্ভব স্পিড তুলে চালাতে লাগলাম। এখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতেও পারছি না। অবশ্য পিছন থেকে শিবু আর শংকর ক্রমাগত চিৎকার করে যেতে লাগল। ঝড়ের বেগে জিপ চালিয়ে যখন পাথর খাদানের কাছে এসে পৌঁছলাম তখন ওরা একটু শান্ত হলো। খাদানের বাঁকগুলো সাবধানে পেরিয়ে চড়াইটা ধরে যখন জঙ্গলের দিকে উঠতে শুরু করলাম তখন শিবু পিছন থেকে আমার কাঁধ খামচে ধরে ভয়ার্ত গলায় বলল, "পণ্ডিত, আজ রাতে আর তোকে কিছুতেই ফিরতে দুব নাই, উ নিশাই টা তুকে মেরে ফেলবেক নাহলে।"

জিপটা গোঁক গোঁক করে চড়াই ঠেলে উপরে উঠছিল। আমি

শিবুর কথার কোনও জবাব দিলাম না। ওদের নিরাপদে গ্রামে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। আমি তো বিশাইকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে আসিনি, আমি এসেছি রাজার মৃত্যুর বদলা নিতে। মরে যাবার ভয় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে আমার। কী জানি, হয়তো মরার জন্যই আবার এখানে ফিরে এসেছি। ভৈরব আমার পাশে বসে আমার দিকেই তাকিয়েছিল, হয়তো শুনতে চাইছিল আমি আবার ওই বাড়িতে ফিরব কিনা। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম, আমি বেঁচে থাকতে ওর কোনও ভয় নেই। ও আমার আশ্রিত, ওকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

১৪

কাঁড়বাঁধি গ্রামে ঢুকতে শিবু আর শংকর ওদের বাড়ির কাছে জিপ থেকে নেমে গেল, ওদের পাশাপাশি বাড়ি। শিবুর বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া বটগাছটার তলায় শংকরের বাবা হাড়মা মান্ডি, শিবুর বাবা শীতল টুডু এবং আরও অনেকে উদ্বিগ্ন মুখে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিশাইয়ের এই উপদ্রবের সময় সন্ধ্যে হয়ে যেতেও আমরা গ্রামে না ফেরাতে দুশ্চিন্তায় ছিল ওরা। আমাদের ফিরতে দেখে ওদের চিন্তা কাটল। আমি জিপ থেকে নেমে হাতজোড় করে 'জোহার' জানালাম হাড়মা মান্ডিদের, ওরাও প্রত্যুত্তরে 'জোহার' জানাল। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর ওদের জিপে তুলে নিলাম রাস্তা দেখানোর জন্য।

খ্যাঁটের আয়োজন হচ্ছে গ্রামের পশ্চিম দিকে মারাংবুরুর থানে। যখন ওদের নিয়ে মারাংবুরুর থানে গ্রামের আটচালায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন খ্যাঁটের জোগাড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের দুটো পাড়ার লোক মিলে এই জমায়েতের আয়োজন করে প্রতি বছর। সারা গ্রামের মানুষ সেই আনন্দ উৎসবে অংশ নেয়। শুয়োর, ছাগল, দেশি মুরগি কেটে রান্না করে মহুয়ার ফোয়ারা ছুটিয়ে আনন্দ ফুর্তি চলে সারারাত। ধামসা মাদল বাজিয়ে নেচে, গান গেয়ে ওরা জঙ্গল পাহাড়কে ধন্যবাদ জানায়। প্রণাম জানায়

জঙ্গলের দেব-দেবীদের। এর আগেও আমি বেশ কয়েক বার ওদের এই উৎসবে এসেছিলাম, ওদের আনন্দে সামিল হয়েছিলাম। আমি আদিবাসী না হলেও ওরা ভালোবেসে আমাকে তাদেরই একজন ভেবে আপন করে নিয়েছিল।

জিপটা একটা বড় মহুয়া গাছের নীচে রেখে মারাংবুরুর থানে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে গেলাম। মারাং মানে বড় আর বুরু মানে পাহাড় বা ঠাকুর, অর্থাৎ পাহাড়ের বড় ঠাকুর। এক প্রাচীন শাল গাছের নীচে পাথরে ঘেরা একটা জায়গায় মারাংবুরু অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। আদিবাসী সাঁওতালদের পূর্বপুরুষেরা মারাংবুরুকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেটে গেছে, কিন্তু ভক্তি আর বিশ্বাসে কখনও ভাটা পড়েনি। যে সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিকুলতা এই জঙ্গল পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের উপর নেমে আসে তার থেকে রক্ষা করেন ওই মারাংবুরু। আমি নিজেও বিশ্বাস করি মারাংবুরুর মহিমার কথা। যেখানে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ভক্তি এবং বিশ্বাস আছে, ঈশ্বর সেখানেই বসবাস করেন।

লোকজন এখনও সবাই আসেনি তবে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আটচালায় ভিড় করে মহা হুল্লোড় শুরু করেছে। বাইরে এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামের মানুষরা জটলা পাকিয়ে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গল্প করছে। ভৈরব এত লোকজন আর ধামসা মাদলের আওয়াজে উত্তেজিত হয়ে ফুর্তিতে ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। গ্রামের কয়েকটা কুকুর ওদিকে আগুনের কাছে বসে ঝিমোচ্ছিল, ভৈরবকে লাফঝাঁপ করতে দেখেই ওরা রে রে করে তেড়ে এলো। ওরা কিছুক্ষণ 'ঘাউ ঘাউ' করে বিরক্তি প্রকাশ করে ভৈরবকে বোঝাতে চাইল যে এই গ্রাম ওদের, বাইরের থেকে এসে এখানে ফাজলামি করলে ওরা সেটা বরদাস্ত করবে না। তারপর যখন দেখল যে ভৈরব চুপচাপ ওদের কথা মেনে নিয়েছে তখন ওর চারদিকে ঘুরে শুঁকতে শুঁকতে 'কুঁই কুঁই' আওয়াজ করে যেন বন্ধুত্ব করতে চাইল। একটুক্ষণ পরেই ওরা সবাই মিলে দৌড়ে লাফিয়ে মুখ চাটাচাটি করে খেলতে শুরু করে দিলো।

আমরা আটচালার দিকে এগোতে বাচ্চাদের দল হইহই করে আমার জিপটার দিকে ছুটে গেল। একটা ছেলে স্টিয়ারিং-এ বসে ড্রাইভার সেজে সবাইকে ডাক দিচ্ছিল প্যাসেঞ্জার হওয়ার জন্য। শীতল খুড়ো লাঠি উঁচিয়ে ওদের তেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি মানা করলাম। খেলুক ওরা নিজের মতো করে, গাড়ির চাবি তো আমার কাছেই আছে, ভয়ের কিছু নেই। হাড়মা মান্ডি, শীতল টুডুরা আমাকে সঙ্গে করে আটচালার ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে বাঁশের মাচার উপর খড় বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, জুতো খুলে পা ঝেড়ে তার উপরে আরাম করে বসলাম। হাড়মা মান্ডি একটা মশাল নিয়ে এসে আটচালার বাঁশের খুঁটিতে আটকে দিলো। লখিরাম হাঁসদা ব্যস্তসমস্ত হয়ে গ্রামের অন্যান্যদের ডেকে আনতে গেল।

শিবুর দলের ছেলেরা আমার ওখান থেকে ফিরে গ্রামবুড়োদের কাছে আমার আসার কথা জানিয়েছিল। আমি যে ওই ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটিয়েছি এবং বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্যই ফিরে এসেছি এসব জেনে গ্রামবুড়োরা আশ্চর্য হলেও উৎসাহিত হয়েছে। তারাও এই আতঙ্কের শেষ দেখতে চায়। জানি না গ্রামের লোক আমাকে কতটা মেনে নেবে, তবে গ্রামবুড়োরা আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলে আর কেউ বাধা দেবে না। তাছাড়া শিবু, শংকর এরা তো আছেই আমার সঙ্গে। শংকরের বাবা হাড়মা মান্ডি আমাকে খুব ভালো করেই চেনে, প্রথম যখন ওর সঙ্গে পরিচয় হয় তখন ওকে আমি খুব জ্বালাতন করেছিলাম। গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় থেকে কীভাবে ওষুধ বানায়, কোন গাছের কী গুণ বা কোন শেকড় কাছে থাকলে সাপ বা অন্য বিষাক্ত সরীসৃপকে বশ করা যাবে— হাড়মা মান্ডি ভালোবেসে আমাকে সব শিখিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী শেখাতে বাধ্য হয়েছিল। ঝালদা থেকে বাইক নিয়ে এসে দিনরাত ওর বাড়িতে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতাম। হাড়মা মান্ডি বিরক্ত হতো না, ভালোবেসে সমস্ত কিছু শেখাত। নিজে সঙ্গে করে জঙ্গলে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ভেষজ গাছগাছড়া চিনিয়ে দিত। সাপ ধরা, সাপ খুঁজে বার করা— সব কিছু খুব যত্ন

করে শিখিয়েছিল আমাকে। শিখিয়েছিল প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতে আর প্রকৃতির মহৎ অবদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে। জঙ্গলের এই সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষটির কাছে আমি একজন প্রকৃত মানুষ হবার শিক্ষা পেয়েছিলাম। আমি এই জঙ্গল পাহাড়ের কাছে ঋণী। আমি ঋণী এই অশিক্ষিত, প্রকৃতির আপন সন্তান সাঁওতাল আদিবাসী মানুষদের কাছে।

আটচালায় বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধীরে ধীরে গ্রামের লোকজন সবাই আসতে শুরু করল। আটচালার মেঝেতে খড় বিছিয়ে সবার বসার ব্যবস্থা করছিল গ্রামের কয়েকটা ছেলে। শিবু আর শংকর বাড়ি থেকে কেটলি করে গরম চা নিয়ে আসতে চা খেতে খেতে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করলাম। হাড়মা মান্ডি উঠে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর বিশাইয়ের ব্যপারে সামান্য কিছু কথা বলে জানাল যে আমি বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। গ্রামের লোকের সাহায্য পেলে আমি পূজাপাঠ যাগযজ্ঞ করে বিশাইয়ের আতঙ্ক চিরদিনের মতো দূর করে দেবো। এখন গ্রামের লোক চিন্তা করে দেখুক তারা আমাকে সাহায্য করবে কিনা। হাড়মা মান্ডির বক্তব্য শেষ হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে সবাইকে 'জোহার' জানিয়ে বললাম, "আমি আজ পাঁচবছর পরে ফিরে এসেছি শুধুমাত্র ওই বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। আপনাদের সবার সাহায্য পেলে আমার সেই লড়াই অনেক সহজ হবে। এই পাঁচবছর ধরে আমি তন্ত্রমন্ত্র শিখেছি আমার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। আমি কথা দিচ্ছি, এই জঙ্গল পাহাড় এবং পবিত্র গোর্গাবুরুর রাজ্য থেকে ওই অপবিত্র বিশাইকে চিরদিনের মতো তাড়িয়ে দেবো। আপনারা যদি সাহায্য না করেন তবুও আমি এই লড়াই ছেড়ে যাব না। ওই বিশাই আমার প্রিয় বন্ধুকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে, ওকে শেষ না করে আমি এই জঙ্গল ছেড়ে নড়ব না। তাতে যদি আমাকেও মরতে হয় তাহলে মরব। এখন আপনারা বিচার করুন আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন কিনা।"

উপস্থিত সকলে আমার কথা শুনে খুব একটা আশ্বস্ত হলো

বলে মনে হলো না। একটা জোর গুঞ্জন শুরু হলো, সবার মুখেই এক কথা; যখন ওদের জানগুরুই বিশাইকে তাড়াতে পারল না তখন আমি বাচ্চা ছেলে বিশাইকে কীভাবে তাড়াব। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত জনতা দু' দলে ভাগ হয়ে গেল। ছেলে ছোকরারা আমার পক্ষে, আর বাকিরা আমার বিপক্ষে। বুড়োদের মধ্যে শুধুমাত্র হাড়মা মান্ডি আর শীতল টুডু আমার পক্ষে দাঁড়াল। ওরা গ্রামের বিশিষ্ট মানুষ এবং গ্রাম ষোলোআনার মাথাও বটে। গ্রামবুড়োরা আমার সঙ্গে আছে দেখে কেউ জোর বিরোধিতা করল না। কিন্তু আমি চাই সবাই আমাকে সমর্থন করুক। ওদের বিশ্বাস করাতে হবে যে আমি পারব, নাহলে আমার কাজ এগোবে না।

শিবু এতক্ষণ একপাশে চুপ করে বসে সবার কথাবার্তা শুনছিল। গ্রামের লোকেরা আমার বিরোধিতা করতে ও উঠে দাঁড়িয়ে জানাল যে কাল রাত্রে বিশাইটা যখন শংকরদের বাছুরটা ধরে নিয়ে গিয়ে ওই জঙ্গলবাড়ির পিছনে বসে খাচ্ছিল তখন আমি ওই বাড়িতে একাই ছিলাম। বিশাই যখন আমাকে একা পেয়েও কিছু করতে পারল না তখন আমাকে ভরসা করাই যায়। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা জঙ্গলবাড়িতে মৃত বাছুরের লাশটা দাহ করে ফেরার সময় কীভাবে বিশাইটা গর্জন করে আমাদের তাড়া করে এসেছিল এবং তখন কীভাবে আমি ওদের প্রাণ বাঁচিয়ে নিরাপদে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি সে কথাও শিবু খুলে বলল। তাছাড়া আজ যে আমি ওদের গ্রামে এসেছি বিশাইয়ের বাতাস লাগা ওই মহিলাকে দেখতে এবং ওকে সুস্থ করে দেবো বলে কথা দিয়েছি সেটাও বেশ ফলাও করে বলল শিবু। ওর কথা শুনে এবার সবাই নড়েচড়ে বসল। ওই অসুস্থ মহিলাকে সুস্থ করে দেবো শুনে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল হলো সবার।

লখিরাম হাঁসদা এতক্ষণ সব শুনছিল বসে বসে। যে মহিলাটি বিশাইয়ের হাওয়া লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওই মহিলা নাকি ওরই বউ। শিবুর কথাগুলো শোনার পর ও এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "পণ্ডিত, তুই আমার বউটাকে যদি ঠিক করে দিতে পারিস, তালে গাঁয়ের কেউ থাক না থাক আমি

তুর সঙ্গে থাকব। তুই যা বলবি সব করব আমি।"

উপস্থিত জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। পারলে সবাই মিলে তখুনি আমাকে ধরে নিয়ে যায় লখিরামের বাড়িতে। শিবু সবাইকে শান্ত করে বলল, "আজ শুধু উ দেখবেক লখার বউটাকে, তুরা বেফালতু লাফড়া করিস না।"

যাই হোক, আলোচনা শেষে সাব্যস্ত হলো যে গ্রামের লোকেরা আমাকে সব রকম সাহায্য করবে, তবে যতদিন না বিশাইয়ের একটা কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন ওরা কেউ রাতের বেলায় ওই জঙ্গলে যাবে না আমাকে সাহায্য করতে। আমি ওদের আশ্বস্ত করলাম যে বিশেষ দরকার না পড়লে রাত্রে কেন আমি দিনের বেলাতেও কাউকে ডাকব না। আমি নিজের কাজ একা একাই করব, ওদের এসব নিয়ে কোনও হাঙ্গামায় পড়তে হবে না।

১৫

আলোচনা শেষ করে হাড়মা মান্ডিকে সঙ্গে নিয়ে লখিরাম হাঁসদার বাড়িতে গেলাম ওর বউটাকে দেখতে। শিবু আর শংকরও আমাদের সঙ্গেই গেল। আরও অনেকেই আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল কিন্তু মানা করলাম, ফালতু ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই। লখিরাম খুড়ো শশব্যস্ত হয়ে টর্চের আলো দেখিয়ে আমাদের ওর বাড়িতে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় জিপ থেকে আমার ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। ওর ভিতর আমার অনেক জড়িবুটি আর তুকতাকের জিনিসপত্র আছে। যেতে যেতেই শিবু চুপিচুপি আমাকে জানাল, লখিরামের বড় ছেলেটাই জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর আজ এত বছরেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এখন বউটাও এরকম হয়ে যেতে বেচারা দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেছে। শিবুর কথা শুনে রাগে আমার মাথায় দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। ওই বিশাইয়ের জন্য আমরা এতগুলো মানুষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। যাঁর ভুলে ওই বিশাইয়ের উত্থান ঘটেছিল সেই দ্বিজেন মাহাত তাঁর পাপের শাস্তি

পেয়ে গেছেন। কিন্তু বিশাইয়ের অপরাধের শাস্তি এখনও বাকি। গুরুদেবের আশীর্বাদে এবং মারাংবুরুর কৃপায় আমি নিশ্চয়ই ওই বিশাইয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারব, আমাকে করতেই হবে। এতগুলো মানুষের চোখের জল আর যন্ত্রণার কড়ায় গন্ডায় হিসেব নেব বিশাইয়ের কাছে।

কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা লখিরাম খুড়োর বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম। শংকর এগিয়ে গিয়ে বাঁশের আগড়টা খুলে আমাদের ভিতরে যাওয়ার রাস্তা করে দিলো। মাটির দোচালা বাড়ি, আদিবাসীদের বাড়ি ঘরদোর যেমন হয় তেমনই ঝকঝকে পরিষ্কার। একদিকে মূল বসতবাড়ি আর তার লাগোয়া রান্নাঘর, অন্যদিকে গোয়াল আর হাঁস মুরগি শুয়োরের খোঁয়াড়। সাঁওতালদের বাড়িঘর বড় সুন্দর হয়। খড় পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে সেই ছাই পাঁক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে এরা এমন সুন্দর করে ঘরের দেওয়ালে লেপে দেয় যে কোথায় লাগে সিমেন্টের প্লাস্টার।

পরিচ্ছন্ন তকতকে মাটির উঁচু দাওয়ায় একটা দড়ির খাটে শুয়েছিল লখিরামের বউ সাঁজি। কাছে যেতেই একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগল। বুঝলাম জঙ্গলের পোকামাকড় আর মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য কুনকুনির তেল মাখানো হয়েছে তার শরীরে। লখিরাম খুড়োর বৃদ্ধা মা পাশেই মেঝেতে চাটাই পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আমাদের ঢুকতে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে অবাক হয়ে তাকাল। খুড়োর বাকি ছেলেমেয়েরা সব পাড়ার অন্যান্যদের সঙ্গে মারাংবুরুর ওখানে উৎসবে গেছে। আজ সবার বাড়ির লোকজন মারাংবুরুর থানে সারারাত উৎসবে মেতে থাকবে, পাড়াটা তাই ভীষণ রকম নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

লখিরাম খুড়ো ভিতর থেকে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে টাঙিয়ে দিলো। হাড়মা খুড়ো শিবু এবং শংকরকে বারান্দায় খেজুরের চাটাইয়ের উপর বসতে দিলো লখিরামের মা। কালিপড়া হ্যারিকেনের সেই বিবর্ণ ম্লান আলোতে দেখলাম একজন মাঝবয়সী মহিলা খাটিয়াতে শুয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মাঝেমাঝেই অস্ফুটে গুঙিয়ে

উঠে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ভালো করে দেখতেই চোখে পড়ল, বুনো বাবুইয়ের দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ঝাঁকুনির চোটে মহিলার পরনের কাপড় অগোছালো হয়ে আছে দেখে লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমাদের উপস্থিতিতেও ওর মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। শুধু মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত 'উঁউঁউঁ' শব্দ করতে শুরু করল।

লখিরাম খুড়ো জানাল, ওর বউ সাঁজি নাকি সারা দিন এভাবেই শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে। খাইয়ে দিলে খায় নাহলে ওমনিই পড়ে থাকে। একে তাকে ধরে মারছিল, কামড়ে দিচ্ছিল বলে জ্ঞানগুরুর কথামতো ওকে বেঁধে রেখেছে। তিনি কিছু শেকড় আর পাতা দিয়ে গেছেন সেগুলো দু' বেলা বেটে খাওয়াতে হয়। কিন্তু প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল, অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ঝালদাতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারও দেখিয়েছিল খুড়ো। কিন্তু ডাক্তার বলেছে শহরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। বউটার নাকি মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে গেছে বলেই নাকি এরকম করছে। লখিরামের এত টাকা কোথায় যে শহরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবে! ও অনেকবার বলেছিল ডাক্তারকে কিন্তু ডাক্তার বিশাইয়ের ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি। বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লখিরাম খুড়ো। আমার হাত দুটো ধরে বলল, "বউ টকে সারাই দে পণ্ডিত, সারাজীবন তুর কিনা গুলাম হয়ে থাকব। ছিলাটা ত চলেই গেলেক, কিন্তু বউটা ইভাবে চুপ মেরে পড়ে থাকে আর নিজের মনে আনখাই হুঁদুর গুঁদুর করে। উয়াকে ইরকম করতে দেখলে হামার বুক ট ফাটি যায়। উয়াকে ঠিক করি দে পণ্ডিত।"

ওর কান্না দেখে আমার চোখেও জল এসে গেল। নিজের প্রিয়জন যদি এরকম অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায় তাহলে মানুষ কতটা অসহায় বোধ করতে পারে তা আমার থেকে ভালো আর কে বুঝতে পারবে। সেই অভিশপ্ত রাতে রাজার পাগলামির কথা আজও ভুলতে পারিনি। কিন্তু সে তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য

ছিল। অন্যদিকে লখিরাম খুড়ো আজ এতগুলো বছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করে আসছে। ছেলেকে হারানোর শোক তো ছিলই, এখন বউটাও যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে একটা মানুষ আর কতদিন সহ্য করতে পারে।

ওর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম "কাঁদিস না খুড়ো, তোর বউকে আমি সারিয়ে দেবো। কিন্তু এখন ওর গায়ে একটা কাঁথা কম্বল যা হোক ঢাকা দে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডাতে এভাবে খোলা বারান্দায় শুইয়ে রেখেছিস, ঠান্ডা লেগেই বউটা মরবে যে!"

লখিরাম খুড়ো চোখ মুছে ঘরের ভিতর থেকে একটা কম্বল নিয়ে এসে সাঁজির গায়ে চাপিয়ে দিলো। বউটার মধ্যে অবশ্য কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। বোঝাই যাচ্ছে ও আর প্রকৃতিস্থ নেই, খুব বড় কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে ওর মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে না। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে বিশাইকে দেখে ভয় পেয়েছিল। নাকি আরও অন্য কোনও কারণ আছে? কে জানে। যাই হোক, আমি আমার ব্যাগটা খুলে একটা প্লাস্টিকের মোড়কের ভিতর থেকে শ্বাপর্ণীর শেকড়ের গোছাটা বার করলাম। তার থেকে একটা শেকড় নিয়ে ছুরি দিয়ে অল্প কেটে তার উপর কর্পূরের গুঁড়ো মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে শ্বাপর্ণীর ঝাঁঝালো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। শেকড়টাকে কিছুক্ষণ ওভাবে জ্বলতে দিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা দু'হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে চাপ দিতে আগুনটা নিভে গিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করে নিয়ে ধোঁয়া ওঠা শেকড়ের টুকরোটা সাঁজির নাকের কাছে ধরলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সেই বিড়বিড়ানি থেমে গেল। ভীষণ হিংস্র ভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতে গেল বউটা। কিন্তু দড়িতে বাঁধা থাকার জন্য সেটা পারল না। বাধা পেয়ে এত জোরে ছটফট করতে শুরু করল যে বাঁশের খাটিয়ায় 'মচমচ' করে আওয়াজ উঠছিল। বেশ কিছুক্ষণ ভয়ানক ছটফট করে উঠে বসার চেষ্টা করল বউটা, তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল। তবু আরও কিছুক্ষণ ধোঁয়া ওঠা শেকড়ের টুকরোটা ওর নাকের কাছেই ধরে রাখলাম। বুঝতে

পারছিলাম ওর চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, এইবার ও ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়বে। শুনতে পেলাম ও অস্ফুটে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। হয়তো কাউকে ডাকতে চাইছে। কিন্তু কী বলছে সেটা আর শোনা হলো না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে ওর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। আহা! ঘুমোক বেচারা, কতদিন না ঘুমিয়ে আছে। এখন একটু শান্তিতে ঘুমোক।

শেকড়ের টুকরোটা মেঝেতে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। লখিরাম খুড়ো আর ওর বুড়ি মা হাঁ হয়ে আমার কাজগুলো দেখছিল। শিবু আর শংকরের অবস্থাও তথৈবচ। হাড়মা খুড়োও দেখলাম ভীষণ অবাক হয়েছে আমার কাণ্ড দেখে। ও নিজে হাতে করে আমাকে গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় থেকে ওষুধ তৈরি করতে শিখিয়েছে, কিন্তু এই বিদ্যা ওরও জানা নেই। শিষ্যের কৃতিত্বে দেখলাম গুরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কৃতিত্বই বটে, দীর্ঘ ছ'মাস ধরে বউটা পাগলের মতো আচরণ করছিল। ঘুমোতো না, শুধু সারাক্ষণ বিড়বিড় করে যেত আর মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে ভাঙচুর কামড়া-কামড়ি করত। ওকে এত সহজে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারব এটা ওদের ধারণাতীত ছিল। যদিও এই কৃতিত্ব স্বয়ং প্রকৃতির এবং আমার গুরুদেবের, যিনি আমাকে এই শেকড়ের ব্যবহার শিখিয়ে ছিলেন।

শেকড়ের গোছা থেকে কয়েকটা টুকরো লখিরাম খুড়োকে দিয়ে বললাম, "ওর বাঁধনটা খুলে দে, এখন ও শান্ত হয়ে ঘুমোবে। কাল সকালে যদি দেখিস যে আবার বিড়বিড় করছে তাহলে আবার এরকম করে শিকড় জ্বালিয়ে ধোঁয়াটা শুঁকিয়ে দিস। এখন দু তিনদিন এরকম কর, দেখবি ও আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে। তবে আর ওকে বেঁধে রাখিস না।"

লখিরাম হাঁদা অবাক হয়ে শেকড়টা দেখছিল। এই একটা শেকড়ের ধোঁয়াতে ওর বউ ঘুমিয়ে পড়ল দেখে ও ভীষণ অবাক হয়েছে। শেকড়ের মহিমা দেখে হাড়মা মাঝিও কম অবাক হয়নি। "কী শিকড় জ্বালালি উটা বাপ? হামিও চিনতে পারলি নাই?"

হাড়মা খুড়ো কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হাতজোড় করে খুড়োকে 'জোহার' জানিয়ে বললাম, "তুমি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছ খুড়ো। এই শেকড় আমি তোমাকে চিনিয়ে দেবো। তোমাকে এটা দিলে আমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে। আমি জানি, তুমি এটা মানুষের উপকারে লাগাবে।" হ্যারিকেনের সেই হলদে বিষণ্ণ আলোয় দেখলাম হাড়মা মাঝির মুখটা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শ্বাপর্ণী দুর্লভ কোনও ভেষজ গাছ নয়, যে কোনও জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এর ব্যবহার সবাই জানে না। গুরুদেব বলেছিলেন, লোভী মানুষদের কখনওই এই গাছ চিনিয়ে না দিতে। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছিলেন, কখনও যেন নিজের স্বার্থে বা ব্যবসা করার জন্য এইসব গাছগাছড়ার ব্যবহার না করি। প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদ গোপন থাকাই ভালো। লোভী মানুষের হাতে পড়লে এগুলো নিয়ে ব্যবসা হবে এবং এই সব দুর্লভ জিনিস হারিয়ে যাবে প্রকৃতি থেকে।

লখিরাম খুড়ো এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসেছিল। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "তোকে ইগুলার জন্য কত টাকা দিতে হবেক রে পণ্ডিত?" বলতে বলতে ও আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মানে! কীসের জন্য টাকা দিবি তুই?"

"জানগুরু পারলেক নাই, ঝালদার ডাক্তারে পারলেক নাই। আর তুই ঝট করে হামার বউটাকে ঘুম পাড়াই দিলি। ইবছর ভালো চাষ হয় নাই, নাহলে ধান বিক্রি করে তোকে টাকা দিথম্।" বলতে বলতে খুড়ো এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল, "হামার কাছে এখন নগদ টাকা নাই, কিন্তু গাই-গোরু কী লিবি বল? নাইলে ছাগলেই লে গটা কতক।"

এইবার ওর কথা বুঝতে পারলাম। ওর বউয়ের চিকিৎসার জন্য আমাকে নগদ টাকা দিতে পারবে না বলে গোরু ছাগল দিতে চাইছে খুড়ো। আমি রেগে উঠতে গিয়েও ওর সরলতা দেখে হেসে

ফেললাম। "আমার ওসব কিচ্ছু চাই না, তোকে কিছুই দিতে হবে না।"

আমার কথা শুনে লখিরাম খুড়ো অবাক হয়ে বলল, "থালে কি ফিরিতেই সারাবি নকি বউটাকে!"

"হ্যাঁ, ফ্রীতেই সারাব। তোকে কিচ্ছু দিতে হবে না খুড়ো। শুধু যেগুলো বলব সেগুলো নিয়ম মেনে করলেই তোর বউ তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।"

"কিন্তুক তা কীকরে হয়, কিছু তো লিতেই হবেক তোকে।" লখিরাম খুড়ো প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ডাক্তারেও বিজিট লেই, জানগুরুকেও পরনামী দিয়ে খুশি করতে হয়। তোকে যদি খুশি না করি, তাহলে গাঁয়ের লোকে কী বলবেক!"

বুঝলাম বিনা পয়সায় চিকিৎসা নিতে ওর আত্মসম্মানে লাগছে। ও অশিক্ষিত গরীব মানুষ হলেও ওর স্বাভিমান দেখে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ওর মন রাখার জন্য বললাম, "ঠিক আছে খুড়ো, তুই যখন দিতেই চাস তখন আমি নেব। আগে তোর বউ সেরে উঠুক, তারপর একদিন আমাকে পেট ভরে মাংস-ভাত খাইয়ে দিবি। তাহলেই আমি খুশি হয়ে যাব।"

"সে তো খাওয়াবই তোকে। কিন্তু আর কিছু লিবি নাই!" লখিরাম যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে আমি এই সামান্য কিছুতে খুশি হয়ে যাব। এতদিন বউটার জন্য এর ওর কাছে ছোটাছুটি করেছে, ডাক্তার থেকে শুরু করে জানগুরু সবাই টাকার বিনিময়েই ওকে সাহায্য করেছে। এত সহজ শর্তে কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "তোরা আমার ভীষণ কাছের মানুষ খুড়ো, আমার আপন লোক। তোরা ভালো থাকলেই আমি খুশি, আমার আর অন্য কিছু চাই না। এইবার চল, মারাংবুরুর কাছে গিয়ে সবাই মিলে তোর বউয়ের জন্য প্রার্থনা করব, যাতে ও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়।"

এমন সময় খুড়োর বুড়ি মা হঠাৎ উঠে এসে আমার সামনে মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করতেই আমি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে

পড়লাম। "আরে আরে, এটা কী করছ তুমি। ওঠো ওঠো।"

বুড়ি উঠে বসে শাড়ির আঁচলের খুঁট খুলে একটা কয়েন বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরল। আমি মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে ওর হাত থেকে সেই কয়েনটা তুলে নিয়ে বললাম, "তোমাকে তো আমি মানা করতে পারব না বুড়ি। এই টাকাটা আমি তোমার আশীর্বাদ হিসেবেই নিলাম।" তারপর লখিরামের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই দ্যাখ, তোর বুড়ি মা আমাকে প্রণামী দিয়ে দিয়েছে। আর তোকে ওই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না খুড়ো।"

সত্যিই তাই, বুড়ি তার আঁচলের খুঁট থেকে যে অমূল্য সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়েছে তার থেকে বেশি আর কিছু হতেই পারে না! ওর যৎসামান্য সঞ্চয়ের থেকে ওই একটা টাকা আমার কাছে কোটি টাকার থেকেও বেশি দামি।

হাড়মা খুড়ো আমার পিঠ থাবড়ে দিয়ে বলে উঠল, "সাবাস পণ্ডিত, তুই আমার মুখ রাখ্যেছিস বাপ! চল্, তোকে মহুয়া খাওয়াব।"

লখিরামের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আমি মনে মনে বললাম, 'খুড়ো, তুমি জানো না আমি তোমাকে কতটা শ্রদ্ধা করি। তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে প্রকৃতিকে মায়ের মতো ভালোবাসতে। তুমিই শিখিয়েছিলে কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে হয়। তুমি চিনিয়ে দিয়েছিলে প্রকৃতির রূপ এবং স্পর্শ। তুমিই আমার প্রথম গুরু যে আমাকে জীবনের পাঠ দিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার গূঢ় তত্ত্বও আমি তোমার কাছেই প্রথম শিখেছি। সেজন্য তোমার কাছে আমি ঋণী। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আমার সাধনালব্ধ সমস্ত কিছু তোমাকে দিয়ে যাব। এই বনপাহাড়ের মানুষের উপকারে লাগিও। তোমরা ভালো থাকলে আমার মতো আরও অনেক বিক্রম বাঁচার রাস্তা খুঁজে পাবে।'

দূর থেকে ধামসা মাদলের সমবেত আওয়াজ ভেসে আসছিল। মারাংবুরুর থানে নাচগান শুরু হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। লখিরাম খুড়োর দেখানো টর্চের আলোয় আমরা জোরে পা

অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। শিবু আর শংকর যথারীতি জিপের পিছনে চেপে বসল, সামনে আমি আর ভৈরব। ভৈরবকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই অভিশপ্ত বাড়িতে কোনও জীবিত প্রাণীকে রেখে যাওয়ার ঝুঁকি আমি আর কিছুতেই নিতে পারব না।

জিপটা স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিয়ে যখন গেটের কাছে পৌঁছেছি ঠিক তখনই এক প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ ভেসে এলো বাড়িটার দিক থেকে। সেই ভয়ংকর গর্জনের শব্দে যেন সমস্ত জঙ্গল পাহাড় থরথর করে কেঁপে উঠল! ভীষণ চমকে উঠে আর একটু হলেই রাস্তার পাশে একটা গাছে ধাক্কা মেরে ফেলতাম। নেহাত পুরোনো ড্রাইভার তাই কোনও রকমে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে ধাক্কাটা এড়াতে পারলাম। পিছন থেকে শিবু আর শংকর আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, "জোরে চালা পণ্ডিত, ধরে ফেলল রে!"

কেন জোরে চালাব? কে ধরে ফেলবে আমাদের! এসব প্রশ্নের সময় তখন ছিল না। এদিকে ভৈরব লাফ দিয়ে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে রাগে 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে শুরু করেছে, আর ওদিকে পিছন থেকে শিবু আর শংকরের পরিত্রাহি আর্তচিৎকার! প্রাথমিক স্তম্ভনভাবটা কাটিয়ে উঠেই ঝড়ের বেগে জিপটাকে ছোটাতে শুরু করলাম গ্রামের দিকে। পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, তবু যতটা সম্ভব স্পিড তুলে চালাতে লাগলাম। এখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতেও পারছি না। অবশ্য পিছন থেকে শিবু আর শংকের ক্রমাগত চিৎকার করে যেতে লাগল। ঝড়ের বেগে জিপ চালিয়ে যখন পাথর খাদানের কাছে এসে পৌঁছলাম তখন ওরা একটু শান্ত হলো। খাদানের বাঁকগুলো সাবধানে পেরিয়ে চড়াইটা ধরে যখন জঙ্গলের দিকে উঠতে শুরু করলাম তখন শিবু পিছন থেকে আমার কাঁধ খামচে ধরে ভয়ার্ত গলায় বলল, "পণ্ডিত, আজ রাতে আর তোকে কিছুতেই ফিরাতে দুব নাই, উ বিশাই ট তুকে মেরে ফেলবেক নাহলে।"

জিপটা গাঁক গাঁক করে চড়াই ঠেলে উপরে উঠছিল। আমি

শিবুর কথার কোনও জবাব দিলাম না। ওদের নিরাপদে গ্রামে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। আমি তো বিশাইকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে আসিনি, আমি এসেছি রাজার মৃত্যুর বদলা নিতে। মরে যাবার ভয় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে আমার। কী জানি, হয়তো মরার জন্যই আবার এখানে ফিরে এসেছি। ভৈরব আমার পাশে বসে আমার দিকেই তাকিয়েছিল, হয়তো শুনতে চাইছিল আমি আবার ওই বাড়িতে ফিরব কিনা। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম, আমি বেঁচে থাকতে ওর কোনও ভয় নেই। ও আমার আশ্রিত, ওকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

১৪

কাঁড়বাঁধি গ্রামে ঢুকতে শিবু আর শংকর ওদের বাড়ির কাছে জিপ থেকে নেমে গেল, ওদের পাশাপাশি বাড়ি। শিবুর বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া বটগাছটার তলায় শংকরের বাবা হাড়মা মান্ডি, শিবুর বাবা শীতল টুডু এবং আরও অনেকে উদ্বিগ্ন মুখে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিশাইয়ের এই উপদ্রবের সময় সন্ধে হয়ে যেতেও আমরা গ্রামে না ফেরাতে দুশ্চিন্তায় ছিল ওরা। আমাদের ফিরতে দেখে ওদের চিন্তা কাটল। আমি জিপ থেকে নেমে হাতজোড় করে 'জোহার' জানালাম হাড়মা মান্ডিদের, ওরাও প্রত্যুত্তরে 'জোহার' জানাল। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর ওদের জিপে তুলে নিলাম রাস্তা দেখানোর জন্য।

খ্যাঁটের আয়োজন হচ্ছে গ্রামের পশ্চিম দিকে মারাংবুরুর থানে। যখন ওদের নিয়ে মারাংবুরুর থানে গ্রামের আটচালায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন খ্যাঁটের জোগাড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের দুটো পাড়ার লোক মিলে এই জমায়েতের আয়োজন করে প্রতি বছর। সারা গ্রামের মানুষ সেই আনন্দ উৎসবে অংশ নেয়। শুয়োর, ছাগল, দেশি মুরগি কেটে রান্না করে মহুয়ার ফোয়ারা ছুটিয়ে আনন্দ ফুর্তি চলে সারারাত। ধামসা মাদল বাজিয়ে নেচে, গান গেয়ে ওরা জঙ্গল পাহাড়কে ধন্যবাদ জানায়। প্রণাম জানায়

জঙ্গলের দেব-দেবীদের। এর আগেও আমি বেশ কয়েক বার ওদের এই উৎসবে এসেছিলাম, ওদের আনন্দে সামিল হয়েছিলাম। আমি আদিবাসী না হলেও ওরা ভালোবেসে আমাকে তাদেরই একজন ভেবে আপন করে নিয়েছিল।

জিপটা একটা বড় মহুয়া গাছের নীচে রেখে মারাংবুরুর থানে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে গেলাম। মারাং মানে বড় আর বুরু মানে পাহাড় বা ঠাকুর, অর্থাৎ পাহাড়ের বড় ঠাকুর। এক প্রাচীন শাল গাছের নীচে পাথরে ঘেরা একটা জায়গায় মারাংবুরু অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। আদিবাসী সাঁওতালদের পূর্বপুরুষেরা মারাংবুরুকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেটে গেছে, কিন্তু ভক্তি আর বিশ্বাসে কখনও ভাঁটা পড়েনি। যে সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এই জঙ্গল পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষদের উপর নেমে আসে তার থেকে রক্ষা করেন ওই মারাংবুরু। আমি নিজেও বিশ্বাস করি মারাংবুরুর মহিমার কথা। যেখানে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ভক্তি এবং বিশ্বাস আছে, ঈশ্বর সেখানেই বসবাস করেন।

লোকজন এখনও সবাই আসেনি তবে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আটচালায় ভিড় করে মহা হুল্লোড় শুরু করেছে। বাইরে এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামের মানুষরা জটলা পাকিয়ে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গল্প করছে। ভৈরব এত লোকজন আর ধামসা মাদলের আওয়াজে উত্তেজিত হয়ে ফুর্তিতে ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। গ্রামের কয়েকটা কুকুর ওদিকে আগুনের কাছে বসে ঝিমোচ্ছিল, ভৈরবকে লাফঝাঁপ করতে দেখেই ওরা রে রে করে তেড়ে এলো। ওরা কিছুক্ষণ 'ঘাউ ঘাউ' করে বিরক্তি প্রকাশ করে ভৈরবকে বোঝাতে চাইল যে এই গ্রাম ওদের, বাইরের থেকে এসে এখানে ফাজলামি করলে ওরা সেটা বরদাস্ত করবে না। তারপর যখন দেখল যে ভৈরব চুপচাপ ওদের কথা মেনে নিয়েছে তখন ওর চারদিকে ঘুরে শুঁকতে শুঁকতে 'কুঁই কুঁই' আওয়াজ করে যেন বন্ধুত্ব করতে চাইল। একটুক্ষণ পরেই ওরা সবাই মিলে দৌড়ে লাফিয়ে মুখ চাটাচাটি করে খেলতে শুরু করে দিলো।

আমরা আটচালার দিকে এগোতে বাচ্চাদের দল হইহই করে আমার জিপটার দিকে ছুটে গেল। একটা ছেলে স্টিয়ারিং-এ বসে ড্রাইভার সেজে সবাইকে ডাক দিচ্ছিল প্যাসেঞ্জার হওয়ার জন্য। শীতল খুড়ো লাঠি উঁচিয়ে ওদের তেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি মানা করলাম। খেলুক ওরা নিজের মতো করে, গাড়ির চাবি তো আমার কাছেই আছে, ভয়ের কিছু নেই। হাড়মা মাড্ডি, শীতল খুড়ো আমাকে সঙ্গে করে আটচালার ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে বাঁশের মাচার উপর খড় বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, জুতো খুলে পা ঝেড়ে তার উপরে আরাম করে বসলাম। হাড়মা মাড্ডি একটা মশাল নিয়ে এসে আটচালার বাঁশের খুঁটিতে আটকে দিলো। লখিরাম হাঁসদা ব্যস্তসমস্ত হয়ে গ্রামের অন্যান্যদের ডেকে আনতে গেল।

শিবুর দলের ছেলেরা আমার ওখান থেকে ফিরে গ্রামবুড়োদের কাছে আমার আসার কথা জানিয়েছিল। আমি যে ওই ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটিয়েছি এবং বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্যই ফিরে এসেছি এসব জেনে গ্রামবুড়োরা আশ্চর্য হলেও উৎসাহিত হয়েছে। তারাও এই আতঙ্কের শেষ দেখতে চায়। জানি না গ্রামের লোক আমাকে কতটা মেনে নেবে, তবে গ্রামবুড়োরা আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলে আর কেউ বাধা দেবে না। তাছাড়া শিবু, শংকর এরা তো আছেই আমার সঙ্গে। শংকরের বাবা হাড়মা মাড্ডি আমাকে খুব ভালো করেই চেনে, প্রথম যখন ওর সঙ্গে পরিচয় হয় তখন ওকে আমি খুব জ্বালাতন করেছিলাম। গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় থেকে কীভাবে ওষুধ বানায়, কোন গাছের কী গুণ বা কোন শেকড় কাছে থাকলে সাপ বা অন্য বিষাক্ত সরীসৃপকে বশ করা যাবে— হাড়মা মাড্ডি ভালোবেসে আমাকে সব শিখিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী শেখাতে বাধ্য হয়েছিল। ঝালদা থেকে বাইক নিয়ে এসে দিনরাত ওর বাড়িতে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতাম। হাড়মা মাড্ডি বিরক্ত হতো না, ভালোবেসে সমস্ত কিছু শেখাত। নিজে সঙ্গে করে জঙ্গলে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ভেষজ গাছগাছড়া চিনিয়ে দিত। সাপ ধরা, সাপ খুঁজে বার করা— সব কিছু খুব যত্ন

করে শিখিয়েছিল আমাকে। শিখিয়েছিল প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতে আর প্রকৃতির মহৎ অবদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে। জঙ্গলের এই সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষটির কাছে আমি একজন প্রকৃত মানুষ হবার শিক্ষা পেয়েছিলাম। আমি এই জঙ্গল পাহাড়ের কাছে ঋণী। আমি ঋণী এই অশিক্ষিত, প্রকৃতির আপন সন্তান সাঁওতাল আদিবাসী মানুষদের কাছে।

আটচালায় বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধীরে ধীরে গ্রামের লোকজন সবাই আসতে শুরু করল। আটচালার মেঝেতে খড় বিছিয়ে সবার বসার ব্যবস্থা করছিল গ্রামের কয়েকটা ছেলে। শিবু আর শংকর বাড়ি থেকে কেটলি করে গরম চা নিয়ে আসতে চা খেতে খেতে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করলাম। হাড়মা মান্ডি উঠে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর বিশাইয়ের ব্যাপারে সামান্য কিছু কথা বলে জানাল যে আমি বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। গ্রামের লোকের সাহায্য পেলে আমি পূজাপাঠ যাগযজ্ঞ করে বিশাইয়ের আতঙ্ক চিরদিনের মতো দূর করে দেবো। এখন গ্রামের লোক চিন্তা করে দেখুক তারা আমাকে সাহায্য করবে কিনা। হাড়মা মান্ডির বক্তব্য শেষ হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে সবাইকে 'জোহার' জানিয়ে বললাম, "আমি আজ পাঁচবছর পরে ফিরে এসেছি শুধুমাত্র ওই বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। আপনাদের সবার সাহায্য পেলে আমার সেই লড়াই অনেক সহজ হবে। এই পাঁচবছর ধরে আমি তন্ত্রমন্ত্র শিখেছি আমার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। আমি কথা দিচ্ছি, এই জঙ্গল পাহাড় এবং পবিত্র গোর্গাবুরুর রাজ্য থেকে ওই অপবিত্র বিশাইকে চিরদিনের মতো তাড়িয়ে দেবো। আপনারা যদি সাহায্য না করেন তবুও আমি এই লড়াই ছেড়ে যাব না। ওই বিশাই আমার প্রিয় বন্ধুকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে, ওকে শেষ না করে আমি এই জঙ্গল ছেড়ে নড়ব না। তাতে যদি আমাকেও মরতে হয় তাহলে মরব। এখন আপনারা বিচার করুন আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন কিনা।"

উপস্থিত সকলে আমার কথা শুনে খুব একটা আশ্বস্ত হলো

বলে মনে হলো না। একটা জোর গুঞ্জন শুরু হলো, সবার মুখেই এক কথা; যখন ওদের জানগুরুই বিশাইকে তাড়াতে পারল না তখন আমি বাচ্চা ছেলে বিশাইকে কীভাবে তাড়াব। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত জনতা দু' দলে ভাগ হয়ে গেল। ছেলে ছোকরারা আমার পক্ষে, আর বাকিরা আমার বিপক্ষে। বুড়োদের মধ্যে শুধুমাত্র হাড়মা মাজি আর শীতল টুডু আমার পক্ষে দাঁড়াল। ওরা গ্রামের বিশিষ্ট মানুষ এবং গ্রাম ষোলোআনার মাথাও বটে। গ্রামবুড়োরা আমার সঙ্গে আছে দেখে কেউ জোর বিরোধিতা করল না। কিন্তু আমি চাই সবাই আমাকে সমর্থন করুক। ওদের বিশ্বাস করাতে হবে যে আমি পারব, নাহলে আমার কাজ এগোবে না।

শিবু এতক্ষণ একপাশে চুপ করে বসে সবার কথাবার্তা শুনছিল। গ্রামের লোকেরা আমার বিরোধিতা করতে ও উঠে দাঁড়িয়ে জানাল যে কাল রাত্রে বিশাইটা যখন শংকরদের বাছুরটা ধরে নিয়ে গিয়ে ওই জঙ্গলবাড়ির পিছনে বসে খাচ্ছিল তখন আমি ওই বাড়িতে একাই ছিলাম। বিশাই যখন আমাকে একা পেয়েও কিছু করতে পারল না তখন আমাকে ভরসা করাই যায়। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা জঙ্গলবাড়িতে মৃত বাছুরের লাশটা দাহ করে ফেরার সময় কীভাবে বিশাইটা গর্জন করে আমাদের তাড়া করে এসেছিল এবং তখন কীভাবে আমি ওদের প্রাণ বাঁচিয়ে নিরাপদে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি সে কথাও শিবু খুলে বলল। তাছাড়া আজ যে আমি ওদের গ্রামে এসেছি বিশাইয়ের বাতাস লাগা ওই মহিলাকে দেখতে এবং ওকে সুস্থ করে দেবো বলে কথা দিয়েছি সেটাও বেশ ফলাও করে বলল শিবু। ওর কথা শুনে এবার সবাই নড়েচড়ে বসল। ওই অসুস্থ মহিলাকে সুস্থ করে দেবো শুনে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল হলো সবার।

লখিরাম হাঁসদা এতক্ষণ সব শুনছিল বসে বসে। যে মহিলাটি বিশাইয়ের হাওয়া লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওই মহিলা নাকি ওরই বউ। শিবুর কথাগুলো শোনার পর ও এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "পণ্ডিত, তুই আমার বউটাকে যদি ঠিক করে দিতে পারিস, তালে গাঁয়ের কেউ থাক না থাক আমি

তুর সঙ্গে থাকব। তুই যা বলবি সব করব আমি।"

উপস্থিত জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। পারলে সবাই মিলে তখুনি আমাকে ধরে নিয়ে যায় লখিরামের বাড়িতে। শিবু সবাইকে শান্ত করে বলল, "আজ শুধু উ দেখবেক লখার বউটাকে, তুরা বেফালতু লাফড়া করিস না।"

যাই হোক, আলোচনা শেষে সাব্যস্ত হলো যে গ্রামের লোকেরা আমাকে সব রকম সাহায্য করবে, তবে যতদিন না বিশাইয়ের একটা কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন ওরা কেউ রাতের বেলায় এই জঙ্গলে যাবে না আমাকে সাহায্য করতে। আমি ওদের আশ্বস্ত করলাম যে বিশেষ দরকার না পড়লে রাত্রে কেন আমি দিনের বেলাতেও কাউকে ডাকব না। আমি নিজের কাজ একা একাই করব, ওদের এসব নিয়ে কোনও হাঙ্গামায় পড়তে হবে না।

১৫

আলোচনা শেষ করে হাড়মা মান্ডিকে সঙ্গে নিয়ে লখিরাম হাঁসদার বাড়িতে গেলাম ওর বউটাকে দেখতে। শিবু আর শংকরও আমাদের সঙ্গেই গেল। আরও অনেকেই আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল কিন্তু মানা করলাম, ফালতু ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই। লখিরাম খুড়ো শশব্যস্ত হয়ে টর্চের আলো দেখিয়ে আমাদের ওর বাড়িতে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় জিপ থেকে আমার ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। ওর ভিতর আমার অনেক জড়িবুটি আর তুকতাকের জিনিসপত্র আছে। যেতে যেতেই শিবু চুপিচুপি আমাকে জানাল, লখিরামের বড় ছেলেটাই জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর আজ এত বছরেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এখন বউটাও এরকম হয়ে যেতে বেচারা দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেছে। শিবুর কথা শুনে রাগে আমার মাথায় দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। ওই বিশাইয়ের জন্য আমরা এতগুলো মানুষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। যাঁর ভুলে এই বিশাইয়ের উত্থান ঘটেছিল সেই দ্বিজেন মাহাত তাঁর পাপের শাস্তি

পেয়ে গেছেন। কিন্তু বিশাইয়ের অপরাধের শাস্তি এখনও বাকি। গুরুদেবের আশীর্বাদে এবং মারাংবুরুর কৃপায় আমি নিশ্চয়ই ওই বিশাইয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারব, আমাকে করতেই হবে। এতগুলো মানুষের চোখের জল আর যন্ত্রণার কড়ায় গণ্ডায় হিসেব নেব বিশাইয়ের কাছে।

কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা লখিরাম খুড়োর বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম। শংকর এগিয়ে গিয়ে বাঁশের আগড়টা খুলে আমাদের ভিতরে যাওয়ার রাস্তা করে দিলো। মাটির দোচালা বাড়ি, আদিবাসীদের বাড়ি ঘরদোর যেমন হয় তেমনই ঝকঝকে পরিষ্কার। একদিকে মূল বসতবাড়ি আর তার লাগোয়া রান্নাঘর, অন্যদিকে গোয়াল আর হাঁস মুরগি শুয়োরের খোঁয়াড়। সাঁওতালদের বাড়িঘর বড় সুন্দর হয়। খড় পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে সেই ছাই পাঁক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে এরা এমন সুন্দর করে ঘরের দেওয়ালে লেপে দেয় যে কোথায় লাগে সিমেন্টের প্লাস্টার!

পরিচ্ছন্ন তকতকে মাটির উঁচু দাওয়ায় একটা দড়ির খাটে শুয়েছিল লখিরামের বউ সাঁজি। কাছে যেতেই একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগল। বুঝলাম জঙ্গলের পোকামাকড় আর মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য কুনকুনির তেল মাখানো হয়েছে তার শরীরে। লখিরাম খুড়োর বৃদ্ধা মা পাশেই মেঝেতে চাটাই পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আমাদের ঢুকতে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে অবাক হয়ে তাকাল। খুড়োর বাকি ছেলেমেয়েরা সব পাড়ার অন্যান্যদের সঙ্গে মারাংবুরুর ওখানে উৎসবে গেছে। আজ সবার বাড়ির লোকজন মারাংবুরুর থানে সারারাত উৎসবে মেতে থাকবে, পাড়াটা তাই ভীষণ রকম নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

লখিরাম খুড়ো ভিতর থেকে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে টাঙিয়ে দিলো। হাড়মা খুড়ো শিবু এবং শংকরকে বারান্দায় খেজুরের চাটাইয়ের উপর বসতে দিলো লখিরামের মা। কালিপড়া হ্যারিকেনের সেই বিবর্ণ ম্লান আলোতে দেখলাম একজন মাঝবয়সী মহিলা খাটিয়াতে শুয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মাঝেমাঝেই অস্ফুটে গুঙিয়ে

উঠে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ভালো করে দেখতেই চোখে পড়ল, বুনো বাবুইয়ের দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ঝাঁকুনির চোটে মহিলার পরনের কাপড় অগোছালো হয়ে আছে দেখে লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমাদের উপস্থিতিতেও ওর মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। শুধু মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত 'উঁউঁউঁ' শব্দ করতে শুরু করল।

লখিরাম খুড়ো জানাল, ওর বউ সাঁজি নাকি সারা দিন এভাবেই শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে। খাইয়ে দিলে খায় নাহলে ওমনিই পড়ে থাকে। একে তাকে ধরে মারছিল, কামড়ে দিচ্ছিল বলে জানগুরুর কথামতো ওকে বেঁধে রেখেছে। তিনি কিছু শেকড় আর পাতা দিয়ে গেছেন সেগুলো দু' বেলা বেটে খাওয়াতে হয়। কিন্তু প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল, অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ঝালদাতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারও দেখিয়েছিল খুড়ো। কিন্তু ডাক্তার বলেছে শহরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। বউটার নাকি মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে গেছে বলেই নাকি এরকম করছে। লখিরামের এত টাকা কোথায় যে শহরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবে! ও অনেকবার বলেছিল ডাক্তারকে কিন্তু ডাক্তার বিশাইয়ের ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি। বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লখিরাম খুড়ো। আমার হাত দুটো ধরে বলল, "বউ টকে সারাই দে পণ্ডিত, সারাজীবন তুর কিনা গুলাম হয়ে থাকব। ছিলাটা ত চলেই গেলেক, কিন্তু বউটা ইভাবে চুপ মার্যে পড়ে থাকে আর নিজের মনে আনখাই হুঁদুর গুঁদুর করে। উয়াকে ইরকম করতে দেখলে হামার বুক টা ফাটি যায়। উয়াকে ঠিক করি দে পণ্ডিত।"

ওর কান্না দেখে আমার চোখেও জল এসে গেল। নিজের প্রিয়জন যদি এরকম অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায় তাহলে মানুষ কতটা অসহায় বোধ করতে পারে তা আমার থেকে ভালো আর কে বুঝতে পারবে। সেই অভিশপ্ত রাতে রাজার পাগলামির কথা আজও ভুলতে পারিনি। কিন্তু সে তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য

ছিল। অন্যদিকে লখিরাম খুড়ো আজ এতগুলো বছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করে আসছে। ছেলেকে হারানোর শোক তো ছিলই, এখন বউটাও যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে একটা মানুষ আর কতদিন সহ্য করতে পারে।

ওর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম "কাঁদিস না খুড়ো, তোর বউকে আমি সারিয়ে দেবো। কিন্তু এখন ওর গায়ে একটা কাঁথা কম্বল যা হোক ঢাকা দে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডাতে এভাবে খোলা বারান্দায় শুইয়ে রেখেছিস, ঠান্ডা লেগেই বউটা মরবে যে।"

লখিরাম খুড়ো চোখ মুছে ঘরের ভিতর থেকে একটা কম্বল নিয়ে এসে সাঁজির গায়ে চাপিয়ে দিলো। বউটার মধ্যে অবশ্য কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। বোঝাই যাচ্ছে ও আর প্রকৃতিস্থ নেই, খুব বড় কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে ওর মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে না। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে বিশাইকে দেখে ভয় পেয়েছিল। নাকি আরও অন্য কোনও কারণ আছে? কে জানে। যাই হোক, আমি আমার ব্যাগটা খুলে একটা প্লাস্টিকের মোড়কের ভিতর থেকে শ্বাপর্ণীর শেকড়ের গোছাটা বার করলাম। তার থেকে একটা শেকড় নিয়ে ছুরি দিয়ে অল্প কেটে তার উপর কর্পূরের গুঁড়ো মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে শ্বাপর্ণীর ঝাঁঝালো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। শেকড়টাকে কিছুক্ষণ ওভাবে জ্বলতে দিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা দু'হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে চাপ দিতে আগুনটা নিভে গিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করে নিয়ে ধোঁয়া ওঠা শেকড়ের টুকরোটা সাঁজির নাকের কাছে ধরলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সেই বিড়বিড়ানি থেমে গেল। ভীষণ হিংস্র ভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতে গেল বউটা। কিন্তু দড়িতে বাঁধা থাকার জন্য সেটা পারল না। বাধা পেয়ে এত জোরে ছটফট করতে শুরু করল যে বাঁশের খাটিয়ায় 'মচমচ' করে আওয়াজ উঠছিল। বেশ কিছুক্ষণ ভয়ানক ছটফট করে উঠে বসার চেষ্টা করল বউটা, তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল। তবু আরও কিছুক্ষণ ধোঁয়া ওঠা শেকড়ের টুকরোটা ওর নাকের কাছেই ধরে রাখলাম। বুঝতে

পারছিলাম ওর চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, এইবার ও ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়বে। শুনতে পেলাম ও অস্ফুটে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। হয়তো কাউকে ডাকতে চাইছে। কিন্তু কী বলছে সেটা আর শোনা হলো না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে ওর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। আহা! ঘুমোক বেচারা, কতদিন না ঘুমিয়ে আছে। এখন একটু শান্তিতে ঘুমোক।

শেকড়ের টুকরোটা মেঝেতে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। লখিরাম খুড়ো আর ওর বুড়ি মা হাঁ হয়ে আমার কাজগুলো দেখছিল। শিবু আর শংকরের অবস্থাও তথৈবচ। হাড়মা খুড়োও দেখলাম ভীষণ অবাক হয়েছে আমার কাণ্ড দেখে। ও নিজে হাতে করে আমাকে গাছগাছড়া শেকড়-বাকড় থেকে ওষুধ তৈরি করতে শিখিয়েছে, কিন্তু এই বিদ্যা ওরও জানা নেই। শিষ্যের কৃতিত্বে দেখলাম গুরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কৃতিত্বই বটে, দীর্ঘ ছ'মাস ধরে বউটা পাগলের মতো আচরণ করছিল। ঘুমোতো না, শুধু সারাক্ষণ বিড়বিড় করে যেত আর মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে ভাঙচুর কামড়া-কামড়ি করত। ওকে এত সহজে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারব এটা ওদের ধারণাতীত ছিল। যদিও এই কৃতিত্ব স্বয়ং প্রকৃতির এবং আমার গুরুদেবের, যিনি আমাকে এই শেকড়ের ব্যবহার শিখিয়ে ছিলেন।

শেকড়ের গোছা থেকে কয়েকটা টুকরো লখিরাম খুড়োকে দিয়ে বললাম, "ওর বাঁধনটা খুলে দে, এখন ও শান্ত হয়ে ঘুমোবে। কাল সকালে যদি দেখিস যে আবার বিড়বিড় করছে তাহলে আবার এরকম করে শিকড় জ্বালিয়ে ধোঁয়াটা শুঁকিয়ে দিস। এখন দু' তিনদিন এরকম কর, দেখবি ও আবার আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে। তবে আর ওকে বেঁধে রাখিস না।"

লখিরাম হাঁসদা অবাক হয়ে শেকড়টা দেখছিল। এই একটু শেকড়ের ধোঁয়াতে ওর বউ ঘুমিয়ে পড়ল দেখে ও ভীষণ অবাক হয়েছে। শেকড়ের মহিমা দেখে হাড়মা মাঝিও কম অবাক হয়নি। "কী শিকড় জ্বালালি উটা বাপ? হামিও চিনতে পারলি নাই?"

হাড়মা খুড়ো কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হাতজোড় করে খুড়োকে 'জোহার' জানিয়ে বললাম, "তুমি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছ খুড়ো। এই শেকড় আমি তোমাকে চিনিয়ে দেবো। তোমাকে এটা দিলে আমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে। আমি জানি, তুমি এটা মানুষের উপকারে লাগাবে।" হ্যারিকেনের সেই হলদে বিষণ্ণ আলোয় দেখলাম হাড়মা মাঝির মুখটা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শ্বাপর্ণী দুর্লভ কোনও ভেষজ গাছ নয়, যে কোনও জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এর ব্যবহার সবাই জানে না। গুরুদেব বলেছিলেন, লোভী মানুষদের কখনওই এই গাছ চিনিয়ে না দিতে। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছিলেন, কখনও যেন নিজের স্বার্থে বা ব্যবসা করার জন্য এইসব গাছগাছড়ার ব্যবহার না করি। প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদ গোপন থাকাই ভালো। লোভী মানুষের হাতে পড়লে এগুলো নিয়ে ব্যবসা হবে এবং এই সব দুর্লভ জিনিস হারিয়ে যাবে প্রকৃতি থেকে।

লখিরাম খুড়ো এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসেছিল। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "তোকে ইগুলার জন্য কত টাকা দিতে হবেক রে পণ্ডিত?" বলতে বলতে ও আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মানে! কীসের জন্য টাকা দিবি তুই?"

"জানগুরু পারলেক নাই, ঝালদার ডাক্তারে পারলেক নাই। আর তুই ঝট করে হামার বউটাকে ঘুম পাড়াই দিলি। ইবছর ভালো চাষ হয় নাই, নাহলে ধান বিক্রি করে তোকে টাকা দিতম্।" বলতে বলতে খুড়ো এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল, "হামার কাছে এখন নগদ টাকা নাই, কিন্তু গাই-গোরু কী লিবি বল? নাইলে ছাগলেই লে গটা কতক।"

এইবার ওর কথা বুঝতে পারলাম। ওর বউয়ের চিকিৎসার জন্য আমাকে নগদ টাকা দিতে পারবে না বলে গোরু ছাগল দিতে চাইছে খুড়ো। আমি রেগে উঠতে গিয়েও ওর সরলতা দেখে হেসে

ফেললাম। "আমার ওসব কিচ্ছু চাই না, তোকে কিছুই দিতে হবে না।"

আমার কথা শুনে লখিরাম খুড়ো অবাক হয়ে বলল, "থালে কি ফিরিতেই সারাবি নকি বউটাকে!"

"হ্যাঁ, ফ্রীতেই সারাব। তোকে কিচ্ছু দিতে হবে না খুড়ো। শুধু যেগুলো বলব সেগুলো নিয়ম মেনে করলেই তোর বউ তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।"

"ক্কিন্তুক তা কীকরে হয়, কিছু তো লিতেই হবেক তোকে।" লখিরাম খুড়ো প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ডাক্তারেও বিজিট লেই, জানগুরুকেও পরনামী দিয়ে খুশি করতে হয়। তোকে যদি খুশি না করি, তাহলে গাঁয়ের লোকে কী বলবেক!"

বুঝলাম বিনা পয়সায় চিকিৎসা নিতে ওর আত্মসম্মানে লাগছে। ও অশিক্ষিত গরীব মানুষ হলেও ওর স্বাভিমান দেখে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ওর মন রাখার জন্য বললাম, "ঠিক আছে খুড়ো, তুই যখন দিতেই চাস তখন আমি নেব। আগে তোর বউ সেরে উঠুক, তারপর একদিন আমাকে পেট ভরে মাংস-ভাত খাইয়ে দিবি। তাহলেই আমি খুশি হয়ে যাব।"

"সে তো খাওয়াবই তোকে। কিন্তু আর কিছু লিবি নাই!" লখিরাম যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে আমি এই সামান্য কিছুতে খুশি হয়ে যাব। এতদিন বউটার জন্য এর ওর কাছে ছোটাছুটি করেছে, ডাক্তার থেকে শুরু করে জানগুরু সবাই টাকার বিনিময়েই ওকে সাহায্য করেছে। এত সহজ শর্তে কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "তোরা আমার ভীষণ কাছের মানুষ খুড়ো, আমার আপন লোক। তোরা ভালো থাকলেই আমি খুশি, আমার আর অন্য কিছু চাই না। এইবার চল, মারাংবুরুর কাছে গিয়ে সবাই মিলে তোর বউয়ের জন্য প্রার্থনা করব, যাতে ও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়।"

এমন সময় খুড়োর বুড়ি মা হঠাৎ উঠে এসে আমার সামনে মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করতেই আমি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে

পড়লাম। "আরে আরে, এটা কী করছ তুমি! ওঠো ওঠো।"

বুড়ি উঠে বসে শাড়ির আঁচলের খুঁট খুলে একটা কয়েন বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরল। আমি মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে ওর হাত থেকে সেই কয়েনটা তুলে নিয়ে বললাম, "তোমাকে তো আমি মানা করতে পারব না বুড়ি। এই টাকাটা আমি তোমার আশীর্বাদ হিসেবেই নিলাম।" তারপর লখিরামের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই দ্যাখ, তোর বুড়ি মা আমাকে প্রণামী দিয়ে দিয়েছে। আর তোকে ওই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না খুড়ো।"

সত্যিই তাই, বুড়ি তার আঁচলের খুঁট থেকে যে অমূল্য সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়েছে তার থেকে বেশি আর কিছু হতেই পারে না! ওর যৎসামান্য সঞ্চয়ের থেকে ওই একটা টাকা আমার কাছে কোটি টাকার থেকেও বেশি দামি।

হাড়মা খুড়ো আমার পিঠ থাবড়ে দিয়ে বলে উঠল, "সাবাস পণ্ডিত, তুই আমার মুখ রাখ্যেছিস বাপ! চল্, তোকে মহুয়া খাওয়াব।"

লখিরামের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আমি মনে মনে বললাম, 'খুড়ো, তুমি জানো না আমি তোমাকে কতটা শ্রদ্ধা করি। তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে প্রকৃতিকে মায়ের মতো ভালোবাসতে। তুমিই শিখিয়েছিলে কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে থাকতে হয়। তুমি চিনিয়ে দিয়েছিলে প্রকৃতির রূপ এবং স্পর্শ। তুমিই আমার প্রথম গুরু যে আমাকে জীবনের পাঠ দিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার গূঢ় তত্ত্বও আমি তোমার কাছেই প্রথম শিখেছি। সেজন্য তোমার কাছে আমি ঋণী। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আমার সাধনালব্ধ সমস্ত কিছু তোমাকে দিয়ে যাব। এই বনপাহাড়ের মানুষের উপকারে লাগিও। তোমরা ভালো থাকলে আমার মতো আরও অনেক বিক্রম বাঁচার রাস্তা খুঁজে পাবে।'

দূর থেকে ধামসা মাদলের সমবেত আওয়াজ ভেসে আসছিল। মারাংবুরুর থানে নাচগান শুরু হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। লখিরাম খুড়োর দেখানো টর্চের আলোয় আমরা জোরে পা

চালিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। শিবু আমার জন্য বনমুরগির মাংস রান্না করবে বলেছে, সঙ্গে টাটকা মহুয়া। পা দুটো যেন নিজে থেকেই ছুটে যেতে চাইছিল বনমুরগি খাওয়ার লোভে।

১৬

সত্যিই ঠান্ডাটা এবার খুব জাঁকিয়ে পড়েছে। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারধার, আর তার সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া যেন চামড়া ফুঁড়ে গিয়ে ভিতরের হাড়ে অবধি কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। শীতকালে দেখেছি, প্রকৃতি জঙ্গলের চারিদিকে এক আশ্চর্য ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে। ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে চারধারে ঘুরে বেড়ায় আর এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করে নিজের খেয়ালে। যাদের জঙ্গলে থাকার অভিজ্ঞতা নেই তারা এই অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে পড়ে গেলে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে পথ ভুলে ভীষণ ভয় পেয়ে যেতে পারে। অবশ্য জঙ্গলে ভয়ের কারণ শুধু ভূত-প্রেত নয়, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু করে বিষধর সাপ বিছেরও তো অভাব নেই। এইরকম শীতে বা বর্ষার সময় জঙ্গলে অনভিজ্ঞ কারও জন্য পদে পদে মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকে। আর অযোধ্যা পাহাড়ের এই জঙ্গল এলাকায় হাতি, হায়েনা, ভাল্লুক, নেকড়ে, হুঁড়ারের মতো হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। আর অভাব নেই ভয়ংকর কিংবদন্তীর। জানি না বিশাইয়ের ব্যাপারটা কতদূর কী করতে পারব। গ্রামের মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস আছে আমার সঙ্গে, আরও আছে গুরুদেবের আশীর্বাদ। বিশাইয়ের আতঙ্ককে আমি খতম করবই।

এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা পাথরে লেগে জিপটা লাফিয়ে উঠতেই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। সামনেই পাথর খাদানটা তার বিশাল বিশাল গহ্বর নিয়ে মুখব্যাদান করে আছে, মুহূর্তের মধ্যে ব্রেক কষতে একদম খাদের কিনারে গিয়ে জিপটা দাঁড়িয়ে পড়ল। জিপশুদ্ধ খাদে পড়লে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। ভৈরব আমার পাশেই চুপচাপ বসেছিল, আচমকা ঝাঁকুনিতে ভয় পেয়ে 'কুঁই কুঁই' করে ডেকে

উঠল। হয়তো ওর জখম পায়ে আঘাত লাগল। ঠিক সময়ে ব্রেক কষতে না পারলে আজ দু'জনেই বেঘোরে মরতাম।

সামনেই পর পর কয়েকটা পাথরের টিলা আছে, টিলার মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ বাঁক নিয়ে রাস্তাটা উঠে গেছে ওপারের জঙ্গলের দিকে। একটু পিছিয়ে গিয়ে জিপটাকে আবার সোজা রাস্তায় নিয়ে এলাম। শিবু খুব জেদ ধরেছিল, কিছুতেই আমাকে রাত্রে ওই জঙ্গলবাড়িতে ফিরতে দিতে চাইছিল না। অনেক বুঝিয়ে কোনও রকমে চলে এসেছি। ভৈরবকে গ্রামেই রেখে আসতে চেয়েছিলাম। ওখানে আরও অনেক কুকুরের সঙ্গে আনন্দে থাকত এবং ওর নিরাপত্তারও অভাব হতো না। কিন্তু ব্যাটা কিছুতেই থাকতে চাইল না। খেয়ে-দেয়ে জিপে উঠে দেখি ও আগেই উঠে বসে আছে। অগত্যা ওকে নিয়েই ফিরছিলাম।

প্রচণ্ড কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। জিপের হেডলাইটের আলো সেই ঘন কুয়াশা ভেদ করে যেতে পারছে না। যার ফলে কুয়াশায় আলো ছড়িয়ে গিয়ে সামনের রাস্তাটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কয়েক বার রাস্তার পাশে পাথরের স্তূপে ধাক্কা লাগাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিলাম। রাত আন্দাজ একটা হবে, এই মাঝরাতে এভাবে চলে আসাটা সত্যিই খুব ঝুঁকির কাজ হয়ে গেছে। সাবধানে জিপ চালিয়ে পাথর খাদানটা পেরিয়ে গেলাম। সামনে এবার খাড়া চড়াই, এক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে সাবধানে চড়াইটা উঠলাম। সামনে একটু দূরেই সেই বাজ পড়া বিরাট ঝাঁকড়া মহুয়াগাছটা। ঘন কুয়াশা গায়ে মেখে অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে হেডলাইটের আলোতে দেখে মনে হলো কেউ যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে ওই গাছটার নীচে। বেশ লম্বা চওড়া 'কেউ' বলেই মনে হচ্ছে। অবাক হলেও জিপের স্পিড বাড়িয়ে আরেকটু এগিয়ে যেতেই দেখি লোকটা জঙ্গলের রাস্তা ধরে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা সন্দেহ জনক। এই খাঁ খাঁ প্রান্তরে এত রাতে এই পরিবেশে কোনও মানুষের উপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব। ওই কি তাহলে বিশাই নাকি! নাকি অন্য কেউ। কিন্তু কে?

ভৈরবও লোকটাকে দেখতে পেয়েই তারস্বরে ডাকতে শুরু করল। তবে ওর আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছি ও রেগে গিয়ে ডাকছে না, ডাকছে ভয়ে। লক্ষ করলাম, মাঝেমাঝেই লোকটা যেন চোখের সামনে থেকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পুরো এলাকাটা যেরকম ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে তাতে এরকম দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। কুয়াশার কারণে রাস্তাটাও মাঝেমধ্যে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পাথরে ভর্তি এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার কারণে জিপের স্পিডও বাড়াতে পারছি না। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে তো আমাদের লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওর সঙ্গে দূরত্বটা একই রয়ে যাচ্ছে কীভাবে! লোকটা শুধুমাত্র হেঁটে হেঁটে কীভাবে জিপের থেকে এগিয়ে থাকছে? সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে এক একবার যখন ওর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি ঠিক তখনই কোথা থেকে ঘন কুয়াশা এসে ওকে ঢেকে ফেলছে। তারপর যখন কুয়াশা সরে যাচ্ছে তখন দেখছি যে লোকটার সঙ্গে আমাদের মধ্যে দূরত্ব সেই একই রয়ে গেছে। জঙ্গলের দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সেই রহস্যময় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে উঠছে। এইবার একটু একটু ভয় পেতে শুরু করলাম।

জঙ্গলবাড়ি ঢোকার আগে রাস্তা কিছুটা খাড়াই। বর্ষার সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে বৃষ্টির জল এই রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে যায় বলে রাস্তা ভেঙে গিয়ে জায়গায় জায়গায় খাল হয়ে গেছে। এরকমই একটা খালে পড়ে জিপটা প্রচণ্ড রকম ঝাঁকুনি খেয়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে থেমে গেল। হেডলাইট দুটো কয়েক বার দপদপ করে উঠে নিভে যেতেই সেই ভীষণ অন্ধকার যেন মুহূর্তে জিপসমেত আমাদের দু'জনকে গ্রাস করে নিলো। চাবি ঘুরিয়ে আবার স্টার্ট করতে গেলাম কিন্তু স্টার্ট হলো না এবং আশ্চর্যের বিষয়, লাইটগুলোও জ্বলল না। ওগুলো তো ব্যাটারিতে জ্বলে, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলেও হেডলাইটের তো নিভে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। ভালো কন্ডিশনের প্রায় নতুন জিপ। আমি নিজে চালিয়ে যতটুকু বুঝেছি তাতে এরকম মাঝপথে বিগড়ে যাবার

মতো কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় জিপ থেকে নেমে গিয়ে সে দেখব কী, হয়েছে তার উপায় নেই। হঠাৎ টর্চটার কথা মনে পড়তেই যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। জিপের পিছনের সিটের নীচে রাখা ব্যাগের মধ্যেই টর্চটা রয়েছে। টর্চের কথাটা মাথায় আসতেই অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাগটা খুঁজতে শুরু করলাম। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে বুকের উপর চেপে বসে দমবন্ধ করে তুলছে। এখুনি একটু আলোর দেখা না পেলে মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। অনেকেই মুখে নাস্তিকতার বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু এই শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে এই রকম পরিবেশে আমার মতো অবস্থায় পড়লে তাদের নাস্তিকতা কর্পূরের মতো উবে যাবে। খুব ইচ্ছে করে ওসব আঁতেল মার্কা লোকদের ধরে নিয়ে এসে আমার জঙ্গলবাড়িতে দু'দিন আটকে রাখি। সব সাহস একদিনেই হাওয়া হয়ে যাবে। বিশাইয়ের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। অতি বড় সাহসী মানুষের বুকেও কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম জঙ্গলে রাতের হাড় হিম করে দেওয়া নিস্তব্ধতাই যথেষ্ট।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাগটা খুঁজছি এমন সময় জিপের পিছন দিক থেকে ভৈরবের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ভেসে এলো! তারপরই একটা প্রবল ঝটাপটির শব্দ। রাস্তার উপর ছড়িয়ে থাকা অজস্র পাথরের উপর কারা যেন প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। ভৈরব তো আমার পাশেই ছিল, জিপ থেকে নামল কখন? তবে কি কোনও হিংস্র জন্তু ওর উপর হামলা করেছে? কি সর্বনাশ! যেভাবেই হোক ভৈরবকে বাঁচাতে হবে। ওই জখম পা নিয়ে ও বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না। ভৈরবকে বাঁচানোর জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। ব্যাগটা খুঁজে পেয়েই তাড়াতাড়ি টর্চ হাতে নিয়ে ভৈরবের হুঙ্কারের শব্দ অনুসরণ করে ছুটে গেলাম জিপটার পিছন দিকে। চার ব্যাটারির টর্চের সেই চোখ ধাঁধানো আলোয় যা দেখলাম তাতে ভয়ে মাথার চুল অবধি দাঁড়িয়ে গেল।

জিপ থেকে একটু দূরে রাস্তার উপর তখন একটা প্রবল

ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছে। দেখলাম একটা ভীষণ লম্বা চওড়া লোক ভৈরবকে মাটিতে ফেলে ওর গলায় কামড় বসাতে চাইছে। কিন্তু ভৈরবও কম যায় না, ভীষণ গর্জনে আঁচড়ে কামড়ে লোকটাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। টর্চের আলো ওদের উপর পড়তে লোকটা ভৈরবকে ছেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে একটা জান্তব হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল। উফফফ, কি ভয়ংকর চেহারা লোকটার! সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা লোক, গায়ে এক টুকরো সুতো পর্যন্ত নেই। বড় বড় ঝাঁকড়া চুল ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠ পর্যন্ত নেমে গেছে। সেই কুণ্ডলী পাকানো চুলের আড়ালে মুখটা ঢাকা পড়ে গেলেও ওর জ্বলন্ত চোখ দুটো আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ভাঁটার মতো চোখ দুটো দিয়ে যেন জিঘাংসার আগুন ঝরে পড়ছে! ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। লোকটা আকাশের দিকে মুখ তুলে জঙ্গল পাহাড় কাঁপিয়ে 'আঁ- আঁ- আঁ' করে ভয়ানক গর্জন করে উঠতেই সেই শব্দ জঙ্গলে প্রতিধ্বনি তুলে যেন দশগুণ হয়ে ফিরে এলো।

সীমাহীন আতঙ্কে আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। ছুটে পালিয়ে যাবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজ সন্ধ্যার সময় এরকম গর্জনের শব্দ শুনেই তো আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। এই ভয়ংকর লোকটাই তাহলে বিশাই! লোকটা দু'হাত বাড়িয়ে হুঙ্কার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি প্রাণভয়ে এক পা এক পা করে পিছোতে শুরু করেছিলাম। ওদিকে ভৈরব ছাড়া পেয়েই পিছন থেকে লোকটার পা কামড়ে ধরল। কিন্তু লোকটা তাতে ভ্রূক্ষেপই করল না। ভৈরবকে শুদ্ধ টেনে-হিঁচড়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। কিন্তু ভৈরব যেন মরণ কামড় বসিয়ে দিয়েছে। ভীষণ আক্রোশে লোকটার পা কামড়ে ধরে একেবারে ঝুলে পড়ল। আমি এক পা এক পা করে পিছোচ্ছিলাম জিপটার দিকে। এই ভয়ানক চেহারার লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠব না; সেটা আমি ভালোই বুঝতে পারছি। অ্যাক্সিডেন্টে আমার ডান পায়ের পাতাটা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। বাঁদিকের কলারবোনটাও ভাঙা। এই ভাঙাচোরা শরীর

নিয়ে খালি হাতে ওই বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু লড়তে তো আমাকে হবেই। এই ভাঙা পা নিয়ে ছুটে পালানোর মতো ক্ষমতাও তো আমার নেই। কোথায় পালাব!

লোকটা আমার সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়ের একটা ঝাঁকুনিতে ভৈরবকে ছিটকে ফেলে দিলো অনেকটা দূরে। পাথুরে রাস্তায় আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল ভৈরব। তারপর আবার গা ঝাড়া দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে এলো। কিন্তু লোকটা আর দাঁড়াল না, এক ধাক্কায় আমাকে ছিটকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভৈরব লোকটাকে তাড়া করে কিছুদূর গিয়েও আবার ফিরে এলো আমার কাছে। টর্চটা একপাশে ছিটকে পড়েছিল, সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালাম। বিশাইটা পালিয়ে গেল কেন বুঝতে পারলাম না। কী চাইছিল ও? এই রকম অসহায় অবস্থায় আমাকে মেরে ফেলা ওর কাছে খুব কঠিন ছিল না। তাহলে এভাবে পালিয়ে গেল কেন?

১৭

ভৈরব জঙ্গলের দিকে মুখ করে একনাগাড়ে ডেকেই যাচ্ছিল। জঙ্গলের যেদিক দিয়ে বিশাইটা পালিয়ে গেল সেদিকেই আমার জঙ্গলবাড়ি। তার মানে আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। বিশাই আর অশরীরী নেই, সে দেহধারণ করেছে। এইবার বুঝতে পারছি যে বিশাইটা আমার জঙ্গলবাড়িতেই কোথাও তার আস্তানা বানিয়েছে। কিন্তু ঘরগুলো তো সব চাবি দেওয়া। বিশাই যদি দেহধারণ করেও থাকে তাহলে তো তার থাকার একটা জায়গা চাই। জঙ্গলবাড়ির ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকলে তো আজ দিনের বেলাতেই টোকেন মুর্মু বা শংকরের চোখে পড়ে যেত। তাহলে কি পিছনের জঙ্গলটার ওদিকে যে ছুরবি মাসে টিলাটা আছে ওখানেই কোনও পাথরের খোঁদলে লুকিয়ে থাকে। এছাড়া লুকোনোর মতো আর তো কোনও জায়গা এদিকে নেই। কী জানি, তাই হয়তো

হবে। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে ভাবার মতো সময় নেই। পড়ে গিয়ে আমার কোমরে এবং পিঠে বেশ চোট লেগেছে। ডানহাতের কনুইয়ের কাছটায় পাথরে কেটে গিয়ে জ্বালা করতে শুরু করেছে।

একটু সামলে নিয়ে আবার জিপে উঠে বসলাম। দেখি আরেক বার চেষ্টা করে। এঞ্জিন স্টার্ট না হলে আমাকে পায়ে হেঁটেই জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যেতে হবে। এত রাতে এই জঙ্গলে বেশিক্ষণ থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। বিশাইটা পালিয়ে গেলেও ওকে বিশ্বাস নেই, আবার ফিরে আসতে কতক্ষণ! ভৈরব আমাকে জিপে উঠতে দেখে ডাক ছেড়ে ছুটে এলো। বেচারা এমনিতেই ভয় পেয়ে আছে, আমাকে জিপে উঠতে দেখে ভাবল আমি ওকে ছেড়েই পালিয়ে যাচ্ছি। লাফিয়ে সিটে উঠে সামনের পা দুটো আমার কাঁধে তুলে 'কুঁইকুঁই' করে যেন আমাকে ধমক দিতে শুরু করল। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যেও আমার হাসি পেল ভৈরবের কাণ্ড দেখে। ও আমার জন্য ওই ভয়ংকর বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করেছে, ওকে বিপদের মধ্যে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো বেইমান আমি নই।

জিপটা আশ্চর্য জনক ভাবে একবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিয়ে নিলো। অবাক কাণ্ড! তখন তাহলে অত চেষ্টাতেও স্টার্ট হচ্ছিল না কেন! সে যাই হোক, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানেই হয় না। রাত বাড়ছে, এই খোলা জিপে বেশিক্ষণ জঙ্গলে থাকা নিরাপদ নয়। বিশাইয়ের হাত থেকে বেঁচে গেলেও হাতি বা হায়েনার পালের সামনে পড়ে গেলে আর জীবন নিয়ে ফিরতে হবে না। তাড়াতাড়ি স্পিড তুলে চড়াইটা পেরিয়ে জঙ্গলবাড়ির দিকে জিপটা ঘুরিয়ে নিলাম।

বড় অদ্ভুত জায়গায় এই জঙ্গলবাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে হলেও জঙ্গলের এলাকার বাইরে। পশ্চিমদিক বাদ দিয়ে বাকি সবদিকেই গভীর জঙ্গল, আর পূর্বদিকে জঙ্গলের মধ্যে মাইল খানেক দূরেই অযোধ্যা পাহাড়ের এলাকা শুরু হচ্ছে। পশ্চিমদিকে আদিবাসীদের চাষের জমি, তারপরই খোলা প্রান্তর ছড়িয়ে আছে, সেটা পেরোলেই পাথর খাদান। জঙ্গলবাড়ির পিছন

দিকে মানে পূর্বদিকে বাউন্ডারির পরেই শুরু হচ্ছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সেজন্যই ভয়টা আরও অনেক বেশি।

জঙ্গলবাড়ির মেইন গেটটা খোলাই ছিল। আমি জিপ নিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। অন্ধকারে ঘন কুয়াশার মধ্যে হেডলাইটের চোখ ঝলসানো আলোয় কুয়াশা মাখানো বাড়িটাকে মৃত্যুপুরীর মতোই মনে হচ্ছিল।

মনের মধ্যে আর তিলমাত্র সাহস অবশিষ্ট ছিল না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম আজ। ভয়ে এখনও আমার শরীরটা কাঁপছে। কীভাবে যে বেঁচে গেলাম তা একমাত্র ভগবান জানেন। কোনও রকমে জিপটাকে বারান্দা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতেই ভৈরব হঠাৎ কিছু একটা দেখে লাফিয়ে নেমে প্রচণ্ড জোরে হুঙ্কার দিয়ে বাড়িটার পিছন দিকে ছুটে গেল। এই কুকুরটাকে নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। জিপের হেডলাইট জ্বেলে রেখেই আমিও টর্চ নিয়ে ছুটে গেলাম ওর পিছন পিছন। দেখলাম ভৈরব বাড়ির পিছনের সেই সিমেন্টের দাওয়াটাতে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ডাকাডাকি শুরু করেছে। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম, পিছনের ঝোপগুলো ভীষণ আন্দোলিত হচ্ছে। যেন কেউ ঝোপঝাড় ভেঙে পালিয়ে গেল বাউন্ডারিটার দিকে। ওদিকে বাউন্ডারির পাঁচিলটা বহুদিন ধরেই ভাঙা। সেই কবে হাতি এসে পাঁচিল ভেঙেছিল তারপর আর ওটা সারানো হয়ে ওঠেনি। ঝোপঝাড় ভেঙে দুড়দাড় করে কেউ পালিয়ে গেল ওদিকে। কিছু দেখতে পেলাম না অবশ্য। এখন এই অন্ধকারে তার পিছনে তাড়া করে যাওয়া সম্ভব নয়। শরীরে বা মনে সেই জোর আর অবশিষ্ট নেই। চারিদিকে আর একবার ভালো করে টর্চ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। নাহ, আর সন্দেহ জনক কোনও কিছু চোখে পড়ল না। ভৈরবকে কোলে তুলে নিয়ে আবার ফিরে এলাম জিপটার কাছে। ওকে বিশ্বাস নেই, হয়তো এখুনি আবার ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটতে শুরু করবে।

জিপের এঞ্জিন বন্ধ করে বারান্দার গ্রিলের গেটটার তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। ভৈরব বারান্দায় ঢুকে 'কুঁইকুঁই' করে

চারিদিক শুঁকতে আরম্ভ করল, জানি না ও কীসের গন্ধ পাচ্ছে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু ওর কোনও হেলদোল নেই। সত্যিই বড় আশ্চর্য ব্যাপার, ও বিশাইটাকে ভয়ও পাচ্ছে আবার তার সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে নেমে পড়তেও দ্বিধাবোধ করছে না। ভয় এবং সাহসের এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমাকে অবাক করল। বারান্দায় রাখা পোর্টেবল জেনারেটরটা চোখে পড়তে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। উফফ! এই দমবন্ধ করা অন্ধকার আর কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছে না। জেনারেটরটা চালিয়ে দিতেই ঘরের আলোগুলো জ্বলে উঠল। মোবাইলে দেখলাম রাত দুটো বেজে দশ মিনিট হয়েছে। নাহ, আর রাত বাড়িয়ে লাভ নেই। বারান্দার গ্রিলের দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলাম। মজবুত গ্রিল দিয়ে বাড়িটার চারিদিক মোড়া। খুব সহজে কেউ ভিতরে ঢুকে আসতে পারবে না। বাড়িটার ভিতরে আমি নিরাপদ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। ঘুম কিছুতেই আসছিল না। ওদিকে ভৈরবও মেঝেতে শুয়ে 'গররর গররর' করে যাচ্ছে একটানা। ও কিছু একটা সন্দেহ করছে বলেই এরকম করছে। কিন্তু সেটা কী তা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। শিবুর জোরাজোরিতে আজ খাওয়াটাও অনেক বেশি হয়ে গেছে। বহুদিন পর বনমুরগি পেয়ে আমিও লোভ সামলাতে পারিনি। মহুয়াটা খাইনি অবশ্য, তবে সঙ্গে করে অনেকটা নিয়ে এসেছি। পরে ওটা আমার কাজে লাগবে। এখন বেশ ভালোই বুঝতে পারছি যে খাওয়াটা জোর হয়ে গেছে, খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

একটু আগে যা ঘটে গেল তাই ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। আজ অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম। হয়তো সাধুবাবার দেওয়া মালাটার জন্য। দ্বিজেন মাহাত তো বলেই ছিলেন যে মালাটা কাছে থাকতে বিশাই আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। হয়তো বা গুরুদেবের আশীর্বাদেই বেঁচে গেলাম। আমি জানি, তাঁর কৃপাদৃষ্টি সব সময় আমার উপর রয়েছে। মনে মনে গুরুদেবকে প্রণাম করে নিলাম। জানি না তিনি এখন কোথায়, কীভাবে আছেন।

অঘোরী সাধুদের তো আর পাকাপাকি বাসস্থান হয় না। ওঁর কাছে থাকার সময় এইসব ভূতপ্রেত, অপদেবতা, পিশাচ ইত্যাদির মন্ত্র শিখেছিলাম। আমার এখনও মনে আছে, কাশীতে গঙ্গার ঘাটে উনি আমাকে নিভে যাওয়া চিতার উপর শুইয়ে দিয়ে চলে যেতেন। সারারাত ওই চিতার উপর শুয়ে জপ করতে হতো। গুরুদেবের অনুগ্রহে কাশী, হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে থাকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। হয়তো সেজন্যই এরকম দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে একা একা থাকতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু তবুও আমি ভয় পাই। মানুষের কল্যাণের জন্য যে বিদ্যা আমি শিখেছি, পাছে সেই বিদ্যার মান রাখতে না পারি। আজ গুরুদেব সঙ্গে থাকলে এই ভয়টা পেতাম না। মাথার উপর ছাতার মতো তাঁর আশীর্বাদ সব সময় আছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই তো তাঁকে স্মরণ করে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চলে এসেছি।

গুরুদেবের শেখানো তন্ত্র-মন্ত্র, জড়িবুটি ছাড়া আর আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই যা দিয়ে বিশাইকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব। বিশাই কোনও সাধারণ ভূতপ্রেত বা অপদেবতা নয় যে খুব সহজেই তাকে তাড়িয়ে দিতে বা ধ্বংস করে দিতে পারব। বিশাই এক অতি প্রাচীন এবং গুপ্ত তন্ত্রবিদ্যা। রীতিমতো কঠোর সাধনা করে বিশাইয়ের শক্তিকে জাগ্রত করতে হয়। যদিও এটি কোনও শুভশক্তি নয়। স্বার্থান্বেষী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ এই কু-বিদ্যার সাধনা করে বিশাইয়ের শক্তির দ্বারা নিজের বিকৃত কামনা বাসনা চরিতার্থ করে। এবং এই পাপাচারের জন্য একদিন সে নিজেও বিশাইয়ের শিকারে পরিণত হয়। পাপ নিজের বাপকেও ছাড়ে না যে! সামান্য ভুলের জন্য বিশাইয়ের শক্তি সাধকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে প্রথমেই সাধকের আত্মাকে নিজের বশীভূত করে নেয়। তারপর তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি করাতে থাকে। বিশাইয়ের শক্তিকে নাশ করা যায় না, সাময়িক নিষ্ক্রিয় করে রাখা যায় মাত্র। আমাকেও তাই করতে হবে। কিন্তু বিশাইয়ের সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে না

পারলে আমি কিছুই করতে পারব না। এই লড়াই শুধুমাত্র আমার আর বিশাইয়ের মধ্যেই নয়, এই লড়াই শুভশক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তিরও লড়াই। এই লড়াই মানবিকতার সঙ্গে পৈশাচিকতার। গ্রামের ওই সহজ সরল মানুষগুলো যে মারাংবুরুর উপর ভরসা করে বেঁচে আছে, সেই মারাংবুরু নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন। আমি নিশ্চিত যে আমি পারব।

১৮

অনেকক্ষণ ধরে একটা 'কিটকিট' করে একটা শব্দ হচ্ছে। বিছানায় শুয়ে নানান চিন্তা ভাবনার মধ্যে প্রথমে শব্দটাকে আমল দিইনি। ভেবেছিলাম বাইরে বারান্দায় জেনারেটরটা চলছে, তারই আওয়াজ হবে হয়তো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম শব্দটা বারান্দার দিক থেকে আসছে না। ঘরের ভিতরেই কোথাও ওই শব্দটা হচ্ছে।

ঘরের আলোটা নেভানো ছিল। বিছানার পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে জ্বালিয়ে ঘরের চারিদিকে দেখলাম। কোথাও কিছু নজরে পড়ল না। শব্দটা কিন্তু হয়েই চলেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ভৈরব কান খাড়া করে উত্তরের সেই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। আগের দিন রাত্রে ওই দিকের জানালা থেকেই তো বিশাইটা রক্তমাখা হাড়ের টুকরোটা ছুঁড়ে মেরেছিল। সেজন্য জানালাটা আজ বন্ধ করে রেখেছিলাম। অন্য জানালাগুলো অবশ্য খোলা তবে সেগুলোতে শক্ত স্টিলের জাল বসানো আছে। উত্তরের জানালাটা ব্যবহার হয় না বলেই ওতে জাল বসানো হয়নি। ভৈরবের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম উত্তরের দেওয়ালে একদম উপরের দিকে যে ঘুলঘুলিটা আছে সেখান থেকে একটা ইঁদুরের মতো প্রাণী উঁকি মারছে। টর্চের আলো পড়তেই ওটা ঘুলঘুলির ফাঁক গলে বাইরে চলে গেল। ওহ, ইঁদুর। আমি আশ্বস্ত হয়ে টর্চ নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ভৈরব কেন জানি না ইঁদুরের উপস্থিতিটা ভালো চোখে নিলো না। আবার 'গররর গরররর' আওয়াজ করতে শুরু

করল।

"ভৈরব, কী হচ্ছে কী? সামান্য ইঁদুর দেখে এত ভয় পেলি হতভাগা!" ধমক দিলাম আমি। ধমক খেয়ে ভৈরব একটু শান্ত হলো। টর্চটা নিভিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু আবার ওই কিটকিট শব্দটা শুরু হয়ে গেল। ইঁদুরগুলো আবার ফিরে এলো নাকি? অন্ধকার ঘরে মনে হচ্ছে যেন আরও কেউ রয়েছে আমাদের সঙ্গেই। খুব কাছে, একদম পাশেই। বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে শব্দটার জন্য। মনে হচ্ছে কেউ যেন দাঁত দিয়ে ঘরের দেওয়াল কেটে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তখনই ভৈরব আবার 'ঘেউ ঘেউ' করে ভীষণ চিৎকার করে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসে টর্চ জ্বেলে দেখি, ভৈরব সেই ঘুলঘুলিটার নীচে দেওয়ালের কাছে গিয়ে লাফিয়ে দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ধমক দিয়ে ডাকলাম ওকে কিন্তু ওর গ্রাহ্যই নেই। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটে গেলাম ভৈরবের কাছে। ওর পায়ে চোট আছে, এভাবে লাফালাফি করলে ব্যান্ডেজ খুলে গিয়ে আবার সমস্যা বেড়ে যাবে। টর্চের আলোয় দেখলাম ঘুলঘুলিতে সেই ইঁদুরটা মুখ বার করে নীচে আমাদের দিকেই দেখছে। কিন্তু একি!

তখন তো একটা ইঁদুর ছিল। এখন দেখি আরও দুটো এসে জুটেছে। ওদের ওই কুঁতকুঁতে চোখগুলোয় কি ভীষণ হিংস্র দৃষ্টি! আলো দেখে ইঁদুরগুলো এবার আর ভয় পাচ্ছে না। তিনজনে মিলে নীচে ঝুঁকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর। ভৈরব এতক্ষণ লাফঝাঁপ দিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছিল কিন্তু এখন দেখি ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার 'কুঁইকুঁই' করে ডাকতে শুরু করেছে। টর্চটা ঘুলঘুলির দিকে ফোকাস করে রেখে ধীরে ধীরে কিছুটা পিছিয়ে এলাম। হাতের কাছে তেমন কিছু নেই যেটা দিয়ে ইঁদুরগুলোকে মারতে পারব। উফফ, ভগবান! এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছি যে সামান্য ইঁদুরকেও ভয় পেতে হচ্ছে। বুকের ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি মনে হচ্ছে। এত অসহায় মনে হচ্ছে কেন নিজেকে? এই তো আমি আছি, ভৈরব

আছে তাহলে ওই সামান্য ইঁদুরকে ভয় পাব কেন? শুধু একটা লাঠি যদি থাকত...

পিছিয়ে পিছিয়ে বিছানার কাছে চলে এলাম। টর্চের আলোয় শুধু ওই ইঁদুরগুলোকেই দেখছি। ইঁদুরগুলোও যেন একদৃষ্টে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। কিন্তু ওকি! তখন যে তিনটে ছিল, এখন মনে হচ্ছে যেন পাঁচটা দেখছি। আরে এ যে ছটা! বুকের মধ্যে যেন ধামসা বাজার মতোই শব্দ হতে শুরু করল। পিছিয়ে যেতে যেতে একদম দরজার কাছে পৌঁছে গেলাম। সামনেই দরজার ডানদিকে সুইচবোর্ডটা রয়েছে, একবার পৌঁছতে পারলে ঘরের জোরালো আলোটা জ্বালিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ইঁদুরগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ওরা ক্রমাগত সংখ্যায় বেড়েই চলেছে। ঘুলঘুলির মধ্যে আর আঁটছে না। এমন সময় সবথেকে বড় ইঁদুরটা লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে আসতেই ভৈরব আমার গা ঘেঁষে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। আরে ধুর, ওই সামান্য ইঁদুরকে কীসের ভয়! আমি সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়াতেই একসঙ্গে সবগুলো ইঁদুর লাফ দিয়ে নেমে এলো নীচে। কিন্তু একি! এত ইঁদুর কোথা থেকে এলো? দেখি শয়ে শয়ে ইঁদুর ঘুলঘুলি থেকে লাফিয়ে নেমে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। টর্চের আলোয় ওদের তীক্ষ্ণ হলদে দাঁতগুলো ঝলসে উঠছে! দাঁতে দাঁত ঘষে 'কিটকিট' শব্দ করতে করতে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। সুইচবোর্ডটা এখানেই তো ছিল। কই, কোথায় গেল? আর একটু মাত্র বাকি, তারপরই তো ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খাবে। হে ভগবান!

কানের কাছে ভৈরবের প্রচণ্ড হুঙ্কারে ঘুমটা ভেঙে যেতেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। উফফফ, এতক্ষণ ধরে কি ভয়ংকর স্বপ্নটাই না দেখছিলাম! ঘেমে একেবারে ভিজে গেছি, গলাটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কানের মধ্যে কেমন 'ভোঁ ভোঁ' আওয়াজ করছে। ভৈরব লাফিয়ে বিছানায় উঠতে চাইছিল। টর্চটা জ্বেলে বিছানার থেকে

নামতে গিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বিছানায় পায়ের কাছে ওটা কী? হে ভগবান! তক্তপোষের পায়া বেয়ে এক বিরাট কালো খরিশ উঠে এসেছে। আমার নড়াচড়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে ফনা তুলে দুলছে। আমার বাঁ পা-টা ওর পেটের কাছে, একটু নড়লেই সোজা পায়ে ছোবল মারবে!

সাক্ষাৎ মৃত্যুদুতকে চোখের সামনে দেখে যেন শ্বাস নিতেও ভুলে গেলাম। এখন এই পরিস্থিতিতে কামড়ে দিলে আমার কোনও বিদ্যাই আমাকে বাঁচাতে পারবে না। হাসপাতাল পৌঁছনোর আগেই শেষ হয়ে যাব। সাপটা জিভ বার করে আমার পজিশন বোঝার চেষ্টা করছিল। সদ্য শীতঘুম ভেঙে উঠেছে, এখন ও কালান্তক যমের সমান। একটু নড়াচড়া করলেই নেমে আসবে বিষের ছোবল। আজই হয়তো আমারও জীবনের শেষদিন। ও আমার উপস্থিতি অনুভব করেই নিয়েছে কিন্তু ভৈরবের লাফালাফি আর চিৎকারে ও বিভ্রান্ত হচ্ছে বলেই এতক্ষণ ছোবলটা মারেনি। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে সোজা ওটার চোখের উপর টর্চটা ফোকাস করলাম। একবার যদি ফনা নামায় বা অন্য দিকে ঘোরে তাহলে হয়তো বেঁচে যেতে পারি। মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলাম। হে গুরুদেব, আমি মরতেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এই রকম অসম্মানের মৃত্যু আমি চাইনি। মরার আগে মৃত্যুর সঙ্গে যদি লড়তেই না পারলাম তাহলে সে মৃত্যুর আর কী মর্যাদা রইল।

সাপটা হঠাৎ ঝুঁকে গিয়ে ফনা পিছনে সরিয়ে নিলো। আমি ওদের এই ভঙ্গিটা চিনি, এইবার বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারবে। মরার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড হুঙ্কারে ভৈরব লাফিয়ে বিছানার উপর উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জন করে ফনা নাচিয়ে সাপটাও ঘুরে গেল ওর দিকে। এই সুযোগটাই তো আমি চাইছিলাম। চোখের পলকে একটা বালিশ তুলে ছুঁড়ে মারলাম সাপটার ফনা লক্ষ্য করে। ভারি বালিশের আঘাতে সাপটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে মেঝেতে নেমে ছুটে গিয়ে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। আর ভয় নেই, এবার সাপটাকে দেখে নিতে পারব।

সাপটা বালিশের তলায় চাপা পড়ে যাওয়ায় রাগে উন্মত্ত হয়ে বারবার বালিশটাকেই ছোবল মারছিল। ভৈরব পায়ে-পায়ে সাপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। হাড়মা মাজি আমাকে সাপ ধরা শিখিয়েছিল। ও বলেছিল, 'সাপের একটাই মাত্র অস্ত্র, আর তা হলো ওর বিষদাঁত। সাপের হাত-পা নেই, শুধু ওই দাঁতের জোরে মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাখে। যদি কোনও ভাবে ওর মুখটা বন্ধ করা যায় তাহলে সাপও যা কেঁচোও তাই।' খুব সাবধানে বালিশটা ধরে টেনে নিলাম। সাপটা ছাড়া পেয়েই ফনা উঁচিয়ে তেড়ে এলো। ছোবলটা নেমে এলো আমার ডান পা লক্ষ্য করে। মুহূর্তে পা-টা সরিয়ে নিয়ে বালিশ দিয়ে ওর মাথাটা চেপে ধরলাম মেঝের সঙ্গে। ব্যাপারটা খুব ঝুঁকির ছিল, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে বালিশটা মেঝেতে চেপে ধরে দু'পা তুলে বালিশটার উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। সাপটা প্রচণ্ড আক্রোশে মেঝেতে সপাৎ সপাৎ করে লেজের বাড়ি মারতে শুরু করল, কিন্তু আমি ছাড়লাম না। ওই প্রচণ্ড চাপে ওর ফনা ভেঙে গিয়ে ও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে শুরু করল।

ভৈরব একটু দূরেই মেঝেতে পায়ের থাবা ঘষতে ঘষতে আমার চারিদিকে ঘুরছিল। আমি ওকে সরিয়ে না দিলে ও সাপের দফারফা করে ছাড়ত। কিন্তু তাতে ওর জীবনের ঝুঁকি ছিল। উফফফ, কি ভয়ংকর কাণ্ডটাই না ঘটে যেত আর একটু হলো! আমি কখনও সাপ মারি না, ওরা প্রকৃতির বড় অমূল্য সম্পদ। কিন্তু যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাতে এই কালান্তক যমকে জীবিত রাখলে মস্ত ভুল করতাম আমি। কিছুক্ষণ পর সাপটা স্থির হয়ে গেছে দেখে বালিশটা সরিয়ে দিলাম। ওর ফনা ভেঙে গেছে, ও আর কিছু করতে পারবে না। ওকে বাঁচিয়ে রেখে আরও কষ্ট দিলে মহাপাপ হবে। ও আর ফনা তুলতে না পারলেও ওকে বিশ্বাস করা যায় না, এই অবস্থাতেও যদি ও একবার কামড় বসাতে পারে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। তক্তপোষটা টেনে নিয়ে এসে তার একটা পায়া সাপটার মাথার উপর বসিয়ে দিলাম। শালকাঠের

ভারি পায়ার চাপে ওর ফনাটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল।

সাপটাকে মারার পর আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই জঙ্গলের ওরাই প্রকৃত বাসিন্দা। আমিই এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি। তবু আমার প্রাণের দায়ে ওকে মরতে হলো। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করে মৃত্যুপথযাত্রী সাপটার কাছে ক্ষমা চাইলাম। ক্ষমা চাইলাম জঙ্গলের দেবতা মারাংবুরুর কাছে। 'হে ভগবান, ক্ষমা করো আমাকে। আমি নিরুপায় ছিলাম। ওকে না মারলে আমাদের মরতে হতো। হে প্রকৃতি, আমি তোমার সন্তানকে হত্যা করেছি। আমাকে ক্ষমা করো, আমি অনুতপ্ত।'

সাপটাকে এভাবে ঘরের মধ্যে ফেলে রাখা যাবে না, ওকে দাহ করতে হবে। কিন্তু তারও আগে দেখতে হবে ও ঘরের মধ্যে ঢুকল কীভাবে! জানালায় স্টিলের জাল লাগানো আছে, সেদিক দিয়ে ঢোকা অসম্ভব। তাহলে কি ওই ঘুলঘুলি দিয়েই ভিতরে ঢুকেছে! আমি যে স্বপ্ন দেখছিলাম তার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? ভৈরব তাহলে এর গন্ধ পেয়েই তখন ওভাবে চারিদিক শুঁকে বেড়াচ্ছিল। ভৈরব জিভ বার করে হাঁফাচ্ছিল, ওকে জড়িয়ে ধরলাম। বিপদেই বন্ধুর পরিচয়। আজ ও না থাকলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। এ নিশ্চয়ই কোনও সামান্য কুকুর নয়। জানি না কোথা থেকে এখানে এলো, কিন্তু আসার পর থেকেই আমার সঙ্গে থেকে আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! তার এক সন্তান আজ আমার জীবন নিতে উদ্যত হয়েছিল, আবার অন্য এক সন্তান নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার জীবন রক্ষা করল। মানুষের সাধ্য কী এই লীলা বোঝার। হাতজোড় করে আবার প্রণাম করলাম সেই পরমা প্রকৃতির উদ্দেশে।

মোবাইলে দেখলাম রাত তিনটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। ভোর হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। এইবার সাপটার একটা গতি করা দরকার। দরজা খুলে সাপটাকে বারান্দায় বার করে নিয়ে এলাম। বেশ ভারি সাপ। বেচারা শীতঘুম ছেড়ে বেরিয়ে এসে চিরঘুমে তলিয়ে গেল দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বারান্দায় মৃদু

শব্দ তুলে জেনারেটরটা চলছে। বারান্দা এবং উঠোনের লাইটগুলো জ্বালানোই ছিল সারা রাত। গ্রিলের দরজাটার চাবি খুলে উঠোনে বেরিয়ে এলাম। বিকেলে শিবুর দলের ছেলেরা অনেক কাঠ নিয়ে এসেছিল জঙ্গল থেকে। বাছুরটাকে দাহ করার পরেও অনেক কাঠ বেঁচে গিয়েছে। সেগুলোই জড়ো করে চিতা সাজালাম সাপটার জন্য। আমি ব্রাহ্মণ, সাপটা আমার শত্রু হলেও ওর অন্তিম সংস্কার করা আমার কর্তব্য। কাঠগুলো দেখি শিশিরে ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে। বারান্দায় একটা জ্যারিকেনে জেনারেটরের জন্য পেট্রোল রাখা ছিল। তার থেকে অল্প পেট্রোল ঢেলে কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

ভৈরব মাটিতে থাবা পেতে বসে চারদিকে লক্ষ রাখছিল। ভোরের প্রচণ্ড কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে গেছে। গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে শিশির ঝরে পড়ছে মাটিতে। পুরো এলাকাটা যেমন শুনশান, তেমনই নিস্তব্ধ। এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক দুনিয়া, যেখানে আমি আর ভৈরব ছাড়া আর কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই! জঙ্গলের মধ্যে এই ভয়ংকর পরিবেশে সত্যিই আমার গা ছমছম করে উঠল। কিন্তু কোথা থেকে একটা আত্মবিশ্বাসও যেন ফিরে পাচ্ছিলাম। একদিনে তিন তিনবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলাম, হয়তো এখুনি আমার কপালে মৃত্যু লেখা নেই।

যাই হোক, সাপটার দাহ কাজ ভালোভাবে শেষ করে কুয়ো থেকে জল তুলে চিতার আগুন নিভিয়ে ফেললাম। আর একটু পরেই ব্রাহ্মমুহূর্ত শুরু হবে, আজ আর ঘুমোবো না। মন বড় উচাটন আজ। ভোর হলেই স্নান করে জপ করতে বসব। একের পর এক আঘাতে মাথাটা কাজ করতে চাইছে না। জপ করলে মানসিক উত্তেজনাটা কেটে গিয়ে মাথা ঠান্ডা হবে। ভৈরবকে নিয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় তালা লাগিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় একটা খসখস আওয়াজ পেলাম উঠোনের আমগাছটার দিক থেকে। চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই একটা বড় পাথরের টুকরো উড়ে এসে গ্রিলে ধাক্কা খেয়ে আমার কপালে লাগল। মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলাম। জ্ঞান হারানোর আগে দেখতে পেলাম, সেই

উলঙ্গ বীভৎস লোকটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে৷ ভৈরবের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারও শুনতে পেলাম। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

১৯

দূর থেকে অনেক মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসছে, আমার পাশেই কেউ যেন চিৎকার করে কেঁদে উঠল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ছায়াছায়া কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে মনে হলো। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

হাত দিয়ে চেপে ধরতে গেলাম, পারলাম না। শরীরটা যেন আর আমার নেই। নড়াচড়াও করতে পারছি না একদম। এ কী অবস্থায় পড়লাম!

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছি। এমন সময় হঠাৎ কেউ যেন আমার পা-টা ধরে টানতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুব কাছ থেকে কোনও কুকুর 'ভৌ ভৌ' করে প্রচণ্ড গর্জন করে ডেকে উঠতেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে সম্বিত ফিরে পেলাম। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গিয়ে দেখলাম বারান্দায় গ্রিলের দরজাটার সামনে মাটিতে পড়ে আছি। আর সেই ভয়ংকর চেহারার লোকটা দরজার ওপার থেকে গ্রিলের ফাঁকে হাত গলিয়ে দিয়ে আমার পা-টা ধরে টানছে৷ প্রচণ্ড জিঘাংসায় হাতটা কাঁধ পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে আমার ডান পা-টা ধরে টেনে যেন বাইরে বার করে করে নিতে চাইছে বিশাইটা। বারান্দায় লাগানো এলইডি-র জোরালো আলোয় আমি বিশাইয়ের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেই বড়বড় চুলে ঢাকা মুখ। মুখটা গ্রিলের সঙ্গে সেঁটে থাকলেও জ্বলন্ত লাল দুটো চোখ আর হলদে দাঁতের ঝলসানি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি পা-টা টেনে সরিয়ে নিতে চাইলাম কিন্তু শরীরে যেন আর এতটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছিলাম

আমি। মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণার অনুভূতিটা ধীরে ধীরে গোটা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল, ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছিল মুখের বাঁদিকটা। বুঝতে পারছিলাম, মুখটা ফুলে উঠছে। মাথাটাও ভারি হয়ে উঠছে। হয়তো সে কারণেই আমি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। হয়তো আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

ঠিক তখুনি ভৈরব হুহুঙ্কারে জঙ্গল পাহাড়ের নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে কামড়ে ধরল বিশাইয়ের হাতটা। ওর সেই রুদ্ররূপ আমি কখনওই ভুলতে পারব না। প্রচণ্ড রাগে যেন বাঘের মতো ফুলে উঠেছিল ভৈরবের শরীরটা। ঝকঝকে ধারালো দাঁতে বিশাইয়ের কালো লোমশ হাতটাকে কামড়ে ধরে যেন ছিঁড়ে নিতে চাইছিল ভৈরব। দু'জনের ভয়ংকর গর্জনে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হলো। বিশাইটা ভৈরবের কামড় অগ্রাহ্য করে অমানুষিক শক্তিতে আমার পা-টা ধরে টানছিল। সেই শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। ভৈরব ওর হাতটা কামড়ে ধরেও তেমন সুবিধে করতে পারছিল না। বেচারির নিজের পা-টাই তো ভাঙা! তবু আপ্রাণ চেষ্টা করছিল বিশাইকে প্রতিহত করার।

হঠাৎ যেন আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল। আমার সামনে ঢালের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে বিশাইয়ের হাত কামড়ে আমার পা-টা ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল ভৈরব। ওর লেজের ঝাপটা এসে লাগছিল চোখে-মুখে। বিশাইটা আমার পা ধরে টেনে তখন প্রায় গ্রিলের কাছে নিয়ে ফেলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শরীরে যেন দানব ভর করল। প্রচণ্ড এক ঝটকায় পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে শক্ত করে বিশাইয়ের হাতটা চেপে ধরলাম, তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হাতটা ধরে টেনে সাঁটিয়ে দিলাম উলটো দিকের দেওয়ালে। 'মট' করে হাতের কনুইটা উলটো দিকে ঘুরে ভেঙে যেতেই বিশাইয়ের গগনবিদারী আর্তনাদে সমস্ত জঙ্গল পাহাড় কেঁপে উঠল। কিন্তু ওর সেই আর্তনাদ যেন আমার কানে প্রবেশ করল না। প্রতিহিংসার

নেশায় আমি যেন তখন পিশাচ হয়ে উঠেছি। বিশাইয়ের হাতটাকে সজোরে মুচড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে ধরলাম উপরের দিকে। সেই টানে গ্রিলের লোহার পাতগুলো কর্কশ আওয়াজ করে উঠল। বিশাইয়ের মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনে বুঝলাম ওর কাঁধ ভেঙে গেছে। জানি না হঠাৎ কী হয়ে গেল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিশাইয়ের হাতটা ঘড়ির কাঁটার মতো পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম। গ্রিলের কোণায় আমার হাতের চেটোটা প্রচণ্ড জোরে ঘষা খেলো। যন্ত্রণায় শিউরে উঠলাম। হোক যন্ত্রণা, দাঁতে দাঁত চেপে হাতটাকে চেপে ধরলাম মেঝের উপর। বিশাই প্রচণ্ড ঝটকায় হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু তখন আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেছে। এদিক ওদিক তাকাতেই পাথরের টুকরোটা চোখে পড়ল। এটাই তো আমাকে ছুঁড়ে মেরেছিল বিশাইটা। হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিলাম পাথরটা। তারপর মেঝেয় চেপে রাখা হাতটার উপর দমাদ্দম মারতে শুরু করলাম। মুহূর্তের মধ্যে হাতটা থেঁতলে গিয়ে মাংস ছিঁড়ে হাড় বেরিয়ে পড়ল, পচা দুর্গন্ধে ভরে গেল বারান্দাটা। প্রচণ্ড রাগে আমার মুখ দিয়ে অনর্গল অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আসছিল।

"তুই আমার বন্ধুকে মেরেছিস। আরও কতজনকে মেরেছিস। নে, মার এবার। রক্ত খেতে চাস শুয়োরের বাচ্চা? নে, খা এবার।" এতদিনের জমে থাকা প্রচণ্ড রাগ আর যন্ত্রণা যেন ভাষার মাধ্যমে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পাথরটা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছিলাম। বিশাই ভীষণ আর্তনাদ করে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইছিল কিন্তু পেরে উঠছিল না। হঠাৎ ভৈরব লাফিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে আমাকে মেঝেতে ফেলে দিলো। অতর্কিত ধাক্কায় আমি পড়ে যেতেই বিশাইটা আমার হাত ছাড়িয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে আবার উঠে বসে পাথরটা দিয়ে ভৈরবকে মারতে গিয়েই যেন বজ্রাহত হয়ে গেলাম। কেউ যেন আমার মুখের উপর সপাং করে এক ঘা চাবুক কষিয়ে দিলো।

হে ভগবান, আমি কি পিশাচ হয়ে গেলাম! রাগে উন্মত্ত হয়ে এ আমি কাকে মারতে যাচ্ছিলাম? যে ভৈরব নিজের জীবন বিপন্ন

করে আমার জীবন বাঁচাল, আমি কিনা রাগের চোটে তাকেই আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলাম। ছি ছি ছি!

পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম ভৈরবকে। "ক্ষমা করে দে ভৈরব, প্রতিহিংসার জ্বালায় আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এখানে আসিনি। আমি এসেছিলাম বিশাইয়ের শক্তিকে নিস্ক্রিয় করতে। প্রকৃতির নিয়মেই রাজার মৃত্যু হয়েছিল, বিশাই তো শুধু নিমিত্তমাত্র। যে পাশবিকতার সঙ্গে লড়াই করতে আমি এসেছিলাম, এখন বদলা নেবার জন্য আমি নিজেই সেই পাশবিক কাজে উদ্যত হয়ে পড়লাম। যাকে মুক্তি দেওয়ার কথা, রাগে অন্ধ হয়ে তাকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দিতে যাচ্ছিলাম। আমি তো ঈশ্বর নই, কাউকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করে দে ভৈরব, আর একটু হলেই আমার হাত দিয়ে মহাপাপ ঘটে যেত!"

ভৈরব কী বুঝলো কে জানে! ও জিভ দিয়ে আমার কপালটা চেটে দিতে শুরু করল। ওর জিভের স্পর্শে মাথার সেই অসহ্য যন্ত্রণাটা যেন কেটে যাচ্ছিল একটু একটু করে। বড় ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে, শরীর ভেঙে আসছিল ক্লান্তিতে। ভৈরবকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে এলাম। দরজাটা খোলাই থাক, সকালে শিবুরা আসবে কাজ করতে। ওরা ডাকাডাকি করলে সহজেই শুনতে পাব। বারান্দার গ্রিলের দরজাটায় চাবি দেওয়া আছে, বাইরে থেকে কেউ ভিতরে ঢুকে আসতে পারবে না। বিশাইটা যেভাবে জখম হয়েছে তাতে আজ আর ও ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। ভৈরবকে ঘরের মেঝেতে নামিয়ে দিতে ও 'কুঁইকুঁই' করে আমার পায়ের চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। কী জানি, হয়তো অভিযোগ জানাচ্ছে যে আমি ওকে মারতে চেয়েছিলাম। জানি না কেন এমন করে ফেললাম!

রাগের চোটে আমি আমার শিক্ষা সংস্কার পর্যন্ত ভুলে গেলাম। এতবড় অধঃপতন হলো আমার! গুরুদেব বলতেন "তন্ত্র এত সহজ ব্যাপার নয় রে রুদ্র। তোর বড্ড চণ্ডাল রাগ। জানিস

না যে, রাগ মানুষকে পশু বানিয়ে দেয়। এই রাগ বা ক্রোধই সাধনার পথে সব থেকে বড় বাধা, ষড়রিপুর এক রিপু। একদিন তুই নিশ্চয়ই এসব উপলব্ধি করতে পারবি। যেদিন নিজেকে রাগের থেকে মুক্ত করতে পারবি সেদিন অষ্টসিদ্ধির দরজা খুলে যাবে। অষ্টপাশ মুক্ত না হলে সেই পরম তত্ত্বের সন্ধান পাবি না।" গুরুদেব বলতেন অষ্টপাশের কথা—

"ঘৃণা শংকা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।

কুলং শীলং তথা জাতি অষ্টপাশ প্রকীর্তিতাঃ।।"

এই অষ্টপাশ মানুষকে আটটি সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। পাশমুক্ত হতে না পারলে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। তন্ত্রে বলেছে 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।' তন্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি বুঝলেও পাশমুক্ত হওয়া কি এতই সহজ! আমি মানুষ, প্রকৃতির নিয়মেই আমার মধ্যে আবেগ আছে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাবোধ আছে। প্রিয়জনকে হারিয়ে আমি নির্বিকার থাকতে পারি না। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ নই, তাই আমার কষ্ট হয়। আমি জানি, গুরুদেবের কথাই ঠিক। রাগ পুষে রাখলে মানুষের যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। রাগ, ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা এসব তাকে একমুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয় না। ধীরে ধীরে তার মানসিকতা, তার চিন্তাধারাকে গ্রাস করে নেয়। তারপর একদিন সে নিজেও সেই পাশবিক প্রবৃত্তির শিকার হয়। এতদিন যাকে ঘৃণা করে এসেছে, একদিন নিজেকেও সেই একই রকম পশুতে রূপান্তরিত করে ফেলে। আমার মধ্যেও সেই পাশবিক প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। আমার অজান্তেই অবচেতনে ক্রমশ বেড়ে উঠছিল প্রতিশোধস্পৃহা। রাজার মৃত্যু, তাপসী কাকিমার আত্মহত্যা আর জীবনের পথে প্রতিমুহূর্তে পাওয়া নানান আঘাত; সব মিলিয়ে অবচেতনে কোথাও জমে উঠেছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। আজ তা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এলো।

গুরুদেবের আশীর্বাদ আর প্রকৃতির অকৃপণ ভালোবাসা আমাকে শেষমুহূর্তে মহাপাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, অনুতপ্ত হয়ে সেই ভুল শুধরে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগও পেয়েছি। ভগবান সবাইকে এই সুযোগ

দেন না। ভৈরবের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিলাম। এই কুকুরটিও বুঝতে পেরেছিল আমি অন্যায় করতে যাচ্ছি। তাই আমাকে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি মানুষ হয়েও ভুলটা বুঝতে পারলাম না। এ বড় লজ্জার ব্যাপার।

আমি ভুল ভেবেছিলাম ভৈরব, মিথ্যে বড়াই করেছিলাম যে তোকে আমি রক্ষা করব। আজ তিন তিনবার তুই আমার প্রাণরক্ষা করলি। আর আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকেও বাঁচালি। আমি কৃতজ্ঞ তোর কাছে। তুই আমার আশ্রিত নোস, তুই সেই মহান প্রকৃতির অংশ যার আশ্রয়ে আমরা সবাই সুখে শান্তিতে বাস করছি। তুই সত্যিই ভৈরব।'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আবার জড়িয়ে ধরলাম ভৈরবকে, জানি না কেন, ভীষণ কান্না পাচ্ছে। ভৈরব 'ভুকভুক' করে যেন আমাকে ধমক দিলো তারপর জিভ দিয়ে আমার মুখটা চাটতে শুরু করল। জানি না কেন মনে হচ্ছে যে এই দুর্গম জঙ্গলে আমার খেয়াল রাখার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি মা-ই ভৈরবকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভৈরবের আদরের মধ্যে আমি যেন তাঁরই স্পর্শ অনুভব করতে পারছিলাম।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম বাইরের অন্ধকার কেটে গিয়ে এক অপরূপ আলোয় ভরে উঠছে চারপাশের জঙ্গল। ভৈরবকে কোলে তুলে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে জেনারেটরটা বন্ধ করে দিলাম। আর কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন নেই, ওই যে ভোর হয়েছে। আমার মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে সেখানেও ভোরের আলো ফুটে উঠেছে প্রকৃতির আশীর্বাদে। চাবি খুলে উঠোনে বেরিয়ে পড়লাম। ভৈরবকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে ও স্ফূর্তিতে ছোটাছুটি শুরু করল। কাছেই কোথাও কোনও গাছে একটা পাখি ডেকে উঠল 'কুব কুব কুব কুব।'

ঘন কুয়াশা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্ধকারে ডুবে থাকা বনাঞ্চল। ওই তো পুবের আকাশে গেরুয়া রঙ ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে

জামাকাপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ খেয়াল হলো মালাটা তো গলায় নেই! মনে পড়ল, রাত্রে শোবার সময় মালাটা খুলে বালিশের নীচে রেখেছিলাম। এতক্ষণে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে উঠে মালাটি আর পরা হয়নি, তাই বিশাই আমাকে আক্রমণ করার সাহস পেয়েছিল। বালিশের নীচ থেকে মালাটি বার করে কপালে ঠেকিয়ে গলায় পরে নিলাম। ওতে সেই সাধুবাবার আশীর্বাদ মিশে আছে। এই মালাটার জন্যই বিশাই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মনে মনে সেই বৃদ্ধ অঘোরীর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম।

ভৈরব ফুর্তিতে উঠোনের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। ওকে খেলতে দিয়ে আমি স্নানের জন্য কুয়োটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কুয়োতলায় গিয়ে বালতিতে জল তুলে বেদমন্ত্র পাঠ করে মাথায় ঢালতে শুরু করলাম। শরীর জুড়িয়ে গেল উষ্ণ শীতল স্পর্শে। বালতির পর বালতি জল ঢেলে ধুয়ে ফেলতে লাগলাম শরীরের এবং মনের সমস্ত গ্লানি। নাহ, আর আমার কোনও রাগ নেই।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রথম কিরণ আমার শরীর স্পর্শ করতেই দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে পবিত্র বেদ মন্ত্র পাঠ করলাম—

"ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব।।"

শুনতে পেলাম পুবের জঙ্গল থেকে হাজার হাজার পাখির ডাক ভেসে আসছে। জঙ্গলের ঘুম ভেঙেছে, মহা কলরোলে সে জেগে উঠেছে আবার। সূর্যের সঙ্গে সপ্তাশ্বযুক্ত রথে চড়ে যেন বনদেবী ফিরে এলেন তাঁর জঙ্গলে। ভৈরব আনন্দের চোটে আকাশের দিকে মুখ তুলে সুর করে ডেকে উঠল 'উ- উ- উ- ঔ- ঔ- ঔ।'

মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ হচ্ছিল। এক অজানা তৃপ্তির অনুভূতি হচ্ছিল সারা শরীর জুড়ে।

স্নান স্তোত্রপাঠ সেরে ঘরে এসে ঢুকলাম। আমার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে গেছে, আর কোনও রাগ দুঃখ নেই। ভিজে

গামছাটা ছেড়ে জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে গ্যাস ওভেনটা রেডি করে কেটলিতে চা বসিয়ে দিলাম। ভৈরব একই ভাবে উঠোনে ছুটে বেড়াচ্ছিল। ওর আবার কীসের এত আনন্দ হলো বুঝতে পারছি না। বড় অদ্ভুত কুকুর, বড় সুন্দর।

চা বানিয়ে গ্লাসে চা নিয়ে আবার উঠোনে বেরিয়ে এলাম। ভৈরবকে ডেকে কয়েকটা বিস্কুট দিতে ওর ফুর্তি আরও বেড়ে গেল। একটা বাটিতে অল্প চা ঢেলে দিলাম ওর জন্য। চায়ে চুমুক দিয়ে উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে চিন্তা করছিলাম, এইবার কী করব। বিশাই যে দেহধারণ করে আছে তা তো জেনেই গেছি। এখন ওকে দেহমুক্ত করতে হবে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া খুব সহজ নয়, বড় জটিল এবং ভয়ংকর। বিশাইকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে আমাকেও বিশাইয়ের সাধনা করতে হবে। নিজের অন্তরে বিশাইয়ের শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। তারপর তাকে নিজের বশীভূত করে যে শরীরটা ওই বিশাই ধারণ করে আছে সেই শরীর থেকে ওকে মুক্ত করতে হবে।

এ নিশ্চয়ই সেই হতভাগ্য আদিবাসী ছেলেটা, যে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। কী জানি, হয়তো লখিরামের বউ সাঁজি জঙ্গলে ছাগল খুঁজতে এসে বিশাইয়ের দেখা পেয়েছিল। নিজের ছেলের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে সাঁজি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। কী জানি, হয়তো তাই।

হে ঈশ্বর, এ কোন কঠিন পরীক্ষায় ফেললে আমাকে! শেষে কিনা বিশাই সাধনা করতে হবে? ওই অপশক্তির সাধনা করে তাকে বশীভূত করতে হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী আমি শেষে কিনা শয়তানের সাধনা করব! কিন্তু অন্য কোনও উপায়ও তো নেই। বড় দোটানায় পড়ে গেলাম। আমি তন্ত্রবিদ্যা শিখেছি গুরুদেবের কাছে, মহান অঘোরব্রতে দীক্ষিত হয়েছি। বিশাই সাধনা আমার কাছে কঠিন হবে না। কিন্তু যদি লোভ লালসার ফাঁদে পড়ে অনাচার করে ফেলি! তাহলে সারা জীবন এই জঙ্গলের মধ্যে বিশাই হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তার থেকে মৃত্যুও ভালো। নাহ, অন্য কোনও উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

পিছন থেকে প্যান্টে টান পড়তে ফিরে দেখি ভৈরব আমাকে ওর সঙ্গে খেলার জন্য ডাকছে। ওর দিকে চোখ পড়তেই আমি যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। ও ঈশ্বরের দূত, তিন তিনবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে ফিরিয়ে এনেছে। কী জানি, হয়তো ভৈরবই আমাকে এই সমস্যা সমাধানের রাস্তা দেখিয়ে দেবে। মাটিতে ঝুঁকে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "কি রে ভৈরব, আমাকে রাস্তা দেখাবি তো?"

ভৈরব কী বুঝল জানি না, পা দুটো আমার বুকের উপর তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল 'ভৌ ভৌ।'

২০

এমন সময় দূর থেকে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসাতে বুঝলাম শিবু আর শংকর তাদের দলবল নিয়ে আসছে। আজ ওদের অনেক কাজ, ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। বাড়ির পিছনের ঝোপঝাড়গুলো কাটতে হবে। তাছাড়া আজ কুয়োটাও ঝালাই করে নিতে হবে। সারাদিন কাটবে আজ ওই নিয়ে। এক চুমুকে গ্লাসের বাকি চা-টুকু শেষ করে গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। ভৈরব আমার আগেই ছুট লাগিয়েছে। গেটের কাছে পৌঁছে দেখি শিবুরা উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলাবলি করতে করতে দ্রুতপায়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। শংকরকে দেখতে পেলাম না, হয়তো আসেনি। কিন্তু একি! প্রত্যেকের মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ দেখা যাচ্ছে কেন?

মুহূর্তে মনটা কু ডেকে উঠল।

শিবু আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো আমার কাছে। উত্তেজিত গলায় বলল, "পণ্ডিত, কাল রাতে কি ইখানে কিছু হইছিল নাকি? আমাদের গাঁয়ে তো বিরাট বেপার হইছে।" কথাগুলো বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চোখ পড়ল ওর। কপালের বাঁদিকে পাথরের ঘায়ে তৈরি হওয়া ক্ষতটা দেখে ও ব্যস্ত হয়ে বলল, "ইটা আবার কী করে, কুথায় বাজালি রে? কাল এত

করে মানা করলম তুকে তুই তবু হাঁকারে চলে আলি।" শিবুর গলায় উৎকণ্ঠা আর রাগ দুটোই প্রকাশ পেল।

আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "এসব ছাড়, তোদের গাঁয়ে কী হয়েছে সেটা আগে খুলে বল। লখিরামের বউটা ঠিক আছে তো?" আমার ভয় হচ্ছিল পাছে লখিরাম হাঁসদার বউ সাঁজির কিছু হয়ে যায়।

শিবু মাথা নেড়ে বলল, "আরে ধুর, উর আর কী হবেক। কাল তুই কি শুঁড়াই দিয়ে আলি তারপর থিকে বেঁহুস ঘুমাচ্ছে। উসব লয়, বুধনার লাশ ট পাওয়া গেছে মারাংবুরুর থানের কাছে। গাঁয়ে বিরাট ভিরকিন্ডি চলছে সেই লিয়ে। সিজন্যেই ত এত সকালে ছুটে আলম তুর কাছে। ভাবলম, দেখি তুর আবার কিছু হলো নকি।"

কে বুধনা, কার লাশ— কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে শিবু বলল, "আরে বুধনা রে, যে জঙ্গলে হরাই গেছল কতদিন আগে। আরে হামদের লখিরামের ব্যাটা রে।" শিবুর কাছে সব শুনে বুঝলাম জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে যে ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল তার নামই হলো বুধন বা বুধনা। এতদিন নিখোঁজ থাকার পর আজ সকালে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে মারাংবুরুর থানের কাছে। পচাগলা ক্ষতবিক্ষত লাশ, ডানহাতের কবজিটা বিশ্রীভাবে থেঁতলানো। গ্রামের লোক খুব ভয় পেয়েছে লাশটা দেখে।

শিবুর বর্ণনা আমার শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কবজি থেঁতলানো পচাগলা লাশ! ওহ ভগবান, ওই বুধনার শরীরেই তাহলে বিশাই বাসা করেছিল এতদিন। কিন্তু শরীরটা ত্যাগ করে দিলো কেন সেটা মাথায় ঢুকল না। এ তো প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যদিও বা একটা উপায় বার করেছিলাম সেটাও বানচাল হয়ে গেল। এখন আবার অপেক্ষা করতে হবে। শিবুকে বললাম, "চল এখুনি একবার তোদের গ্রামে যাব। ব্যাপারটা দেখতে হবে।"

শিবু যেন এই কথাটাই শুনতে চাইছিল। উৎসাহিত হয়ে

বলল, "হুঁ, চল চল। ইয়ারা দেখেশুনো কাজ করুক, ততক্ষণ আমরা ঘুরে আসি।"

শিবুর দলের বাকি ছেলেদের সমস্ত কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে জিপ নিয়ে যখন আমরা কাঁড়বাঁধি গ্রামের উদ্দেশে বেরোলাম তখন সবে সকাল সোয়া সাতটা বেজেছে। জঙ্গলের রাস্তায় চুপচাপ ড্রাইভ করছিলাম। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠছে। বিশাই শরীরটা ত্যাগ করল কেন? এখন কীভাবে ওকে খুঁজে বার করব! কাল রাতে হঠাৎ ওভাবে খেপে গিয়ে হাতটা ভেঙে দিয়েছি বলেই কি খুঁতো শরীরটা ছেড়ে দিলো? কিন্তু ও তো এরপর চুপ করে বসে থাকবে না। আবার দেহধারণ করতে চাইবে। তার মানে আবার কাউকে ওর শিকার বানাবে। আমার হাতে শুধু আজকের দিনটুকু সময় আছে ওকে আটকানোর জন্য। যদি ওকে আটকাতে না পারি তাহলে বিশাইয়ের রক্ত পিপাসা আবার কারও জীবন কেড়ে নেবে। তারপর সেই হতভাগ্যের শরীর দখল করে তাকে পিশাচ বানিয়ে আবার তাণ্ডব শুরু করবে। হে ভগবান, এ তুমি কোন পরীক্ষায় ফেলছ আমাকে!

পুরোটা রাস্তা শিবু একটাও কথা বলল না। অবশ্য আমারও কিছু বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। ভৈরব দেখলাম নির্বিকার ভাবে ড্যাশবোর্ডের উপর পা তুলে চারপাশ দেখতে দেখতে চলেছে। সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও ভৈরবকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ওর আসা থেকে শুরু করে ওর কাজ কারবার— কোনওটাই আমার বোধগম্য হয়নি। জঙ্গলবাড়ির আশেপাশে গ্রাম বলতে তো ওই চাটুমঘুত্তু আর কাঁড়বাঁধি। শিবুরা বলেছে যে ওরা ভৈরবকে কখনওই দেখেনি, তার মানে ও কাঁড়বাঁধি গ্রামের নয়। কিন্তু টোকেন মুর্মুও তো ওকে চিনতে পারেনি, মানে ও চাটুমঘুত্তু গ্রামেরও নয়। তাহলে ও আমার জঙ্গলবাড়িতে এলো কোথা থেকে? আশ্চর্য! তবে যেখান থেকেই আসুক, ও যে আমার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ— তা আমি বুঝে গেছি। কিন্তু ওকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই।

আজ একবার ঝালদাতেও যেতে হবে, কিছু টুকিটাকি

জিনিস কেনার আছে। জিপটাতেও ফুলট্যাঙ্ক তেল ভরে নিতে হবে। স্বরূপের ঘাড়ে চেপে আর কতদিন চালাব। এসব নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসতে শুরু করল।

কাঁড়বাঁধি গ্রামে ঢোকার মুখে বড় বটগাছটার নীচেই শিবুদের বাড়ি। বটগাছটা তার বিরাট বিরাট ডালপালা মেলে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। তারই নীচে ছোট্ট একটা জটলা দেখে আমি জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম শংকর কয়েকটা ছেলেকে বেশ উত্তেজিত ভাবে হাত পা নেড়ে কিছু একটা বোঝাচ্ছে। জিপের আওয়াজ পেতেই শংকর আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "পণ্ডিত, সবই ত শুনেছিস শিবার কাছে। এখুন বল আমরা কী করব?"

বললাম, "আগে পুলিশে খবর দে, লাশটাকে ওরা নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টেম করুক।"

শংকর আমার কথা শুনে হেসে উঠল। বলল, "যা, তবে তুই গ্রামবুড়াদের বুঝা যায়ে। উসব করে কী হবেক? বুধনা আবার বাঁচে যাবেক কি? বেফালতু পচা মড়া ঘাঁটে মরবেক কেনে?"

বললাম, "তবু তো আইন বলে একটা কথা আছে রে। পুলিশে খবরটা জানিয়ে দেওয়াই তো নিয়ম।"

শংকর অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। আমি কবে থেকে এসব আইন আদালত মানতে শুরু করলাম সেটাই ও বুঝে উঠতে পারছিল না। ওর ভাবভঙ্গী দেখে বললাম, "চল, জিপে ওঠ, লাশটাকে একবার দেখে আসি। আমাকে আজ একবার ঝালদা যেতে হবে। যদি পুলিশে খবর দিতে চাস তো কেউ একজন আমার সঙ্গে যাবি।"

শংকর ছেলেগুলোকে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ আনার কথা বলছিল। বুধনার লাশটাকে তো আর ফেলে রাখা যাবে না। বুঝলাম পুলিশে খবর দেওয়ার ইচ্ছে ওদের নেই। মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা দিতে ওরা চায় না। আমারই বা কী দায় পড়েছে ওদের সঙ্গে তর্ক করার। হয়তো ওদের কথাই ঠিক। বুধনা যখন

নিরুদ্দেশ ছিল তখন পুলিশ ওকে খুঁজে বার করতে পারেনি। এখনই আর কী করে নেবে।

ওদের জিপে বসিয়ে মারাংবুরুর থানের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন জায়গাটা ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেছে। সমস্ত গ্রামের লোক ভেঙে এসেছে বুধনাকে দেখতে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেকে এসেছে খবর পেয়ে। হায় রে বুধনা! বেঁচে থাকতে তুই কোনও দিন হয়তো ভাবতেও পারিসনি যে মরে গিয়ে এত বিখ্যাত হবি।

মারাংবুরুর থানের পাশে জঙ্গলে একটা নালা মতো আছে। সেখানেই নালার ভিতর পড়ে আছে বুধনার লাশ। জিপটা একদিকে দাঁড় করিয়ে ভিড়ের সঙ্গে হেঁটে গেলাম নালাটার দিকে। ভীষণ পচা দুর্গন্ধে পুরো এলাকাটা ভরে গেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই যার সঙ্গে লড়াই করছিলাম, সে এখুনি এভাবে পচে গেল! মুখে গামছা চাপা দিয়ে কোনও রকমে এগিয়ে গেলাম নালাটার দিকে। নালাটা এখন শুকনো, বড় বড় পাথর আর বালিতে ভর্তি। তার মধ্যে বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে বুধনা। নীল রঙের কয়েকটা মাছি ভনভন আওয়াজ তুলে বুধনার চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। পচাগলা, ক্ষত বিক্ষত লাশটাকে দেখে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এর সঙ্গেই কাল রাতে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল! ভৈরব বুধনার লাশটাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করতে শুরু করল। ওকে ডেকে নিয়ে নালা থেকে উঠে গ্রামের দিকে ফিরে এলাম। যা দেখার তা আমি দেখে নিয়েছি, এই বুধনাই গতকাল রাতের সেই বিশাই।

ফেরার পথে ভিড়ের মধ্যে হাড়মা মাঝিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাড়মা খুড়োকে সব কথা খুলে বলা দরকার। হাড়মা খুড়ো আমাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, "হেই বাপ পণ্ডিত, ইটা কী শুরু হলো বল দিখি! জুয়ান ছিলা ট ইভাবে মরে গেল! এতদিন উ ছিলেক কুথায়?"

হাড়মা খুড়োকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম। সবার সামনে সব কথা বলা ঠিক হবে না, গ্রামে আরও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। মারাংবুরুর থানের পাশে আমার জিপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে খুড়োকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। খুড়ো সব শুনে ভয় পেয়ে

গেল। বলল, "ইবারে তাহলে কী হবেক বাপ? বিশাই উ-কে কি মারার আর কনো উপায় নাই?"

বললাম, "উপায় আছে, তবে সময় লাগবে। এখন সবার আগে গ্রামের মানুষদের বাঁচাতে হবে। যাতে বিশাইটা আর কাউকে তার শিকার বানাতে না পারে। নাহলে আবার কাউকে মেরে তার শরীরের দখল নিয়ে নেবে।"

হাড়মা খুড়ো ভয়ে শিউরে উঠে বলল, "তুই যা ভালো বুঝিস কর বাপ। হামাদিকে কী করতে হবেক বল, হামি ইখনেই সবাইকে বুলে দিছি।"

খুড়োকে বললাম আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই। এখন বুধনার লাশটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত। পুলিশে না জানিয়ে লাশটাকে পোড়ালে সেটা বেআইনি হবে। শিবুরা তো রয়েইছে, এরাই নাহয় কেউ থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দেবে। আমি তো ঝালদার দিকে যাচ্ছিই। শিবুদের সঙ্গে খুড়োও আমার সঙ্গে চলুক। ওদের থানায় পৌঁছে দিয়ে আমি খুড়োকে নিয়ে বাজারে চলে যাব। তারপর কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে হবে। সন্ধ্যে হবার আগেই পুরো গ্রামটাকে বন্ধন দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যাতে বিশাই আর এই গ্রামের ভিতরে ঢুকতে না পারে। তারপর সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আগামী পূর্ণিমার রাতে আমি বিশাইটার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করব। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। খুড়ো আমার সঙ্গে ঝালদা যেতে রাজি হয়ে গেল। পুলিশে খবর দেওয়ার ইচ্ছে ওদের ছিল না, তবে আমি বুঝিয়ে বলাতে ওরা রাজি হয়ে গেল।

শিবুকে ডেকে নিয়ে বললাম লাশটার ব্যবস্থা করে ওরা যেন তাড়াতাড়ি জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যায়। ওখানে যারা কাজ করছে তাদের নিয়ে যেন বিকেলের আগেই গ্রামে ফিরে আসে। আমিও ঝালদা থেকে সোজা গ্রামেই ফিরে আসব। রাতের খাওয়া দাওয়া এখানেই সেরে নিয়ে তারপর জঙ্গলবাড়িতে ফিরে যাব। ভৈরবকে শংকরের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে জিপ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম

ঝালদার উদ্দেশে। রাস্তায় যেতে যেতে খুড়োর সঙ্গে আরও অনেক কথা সেরে নিলাম। এই কাজ আমার একার দ্বারা সম্ভব হবে না। বিশাইকে মুক্তি দিতে এবং এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করতে গ্রামের সবার সাহায্য আমার প্রয়োজন। হাড়মা খুড়ো সেই ব্যবস্থাটুকু করে দিলেই আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

২১

ঝালদায় পৌঁছে বাজার থেকে যাগযজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে একবার স্বরূপের সঙ্গে দেখা করতে ওর গ্যারেজে গেলাম। আমার মোবাইলটা বন্ধ থাকায় ও আমাকে ফোন করেও পায়নি। অবশ্য জঙ্গলের ওই এলাকায় নেটওয়ার্ক পাওয়াও যায় না ঠিকমতো। সেজন্য আমি মোবাইলটা সুইচড্ অফ করে রেখে দিয়েছিলাম। আমাকে কল করে পায়নি বলে স্বরূপ ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। হাড়মা খুড়োর সঙ্গে আমাকে গ্যারেজে ঢুকতে দেখে ও উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এলো। "এসব কী শুনছি বিক্রম'দা? কাঁড়বাঁধিতে নাকি কার একটা লাশ পাওয়া গেছে!"

"তুই কোথায় শুনলি?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

স্বরূপ রেগে গিয়ে বলল, "আমি কি বিদেশে থাকি যে আমার পাশের গ্রামের খবর জানতে পারব না! তুমি সত্যি করে বলো তো, ওখানে আসলে হচ্ছেটা কী?"

কথাটা ঠিক, এসব খবর গোপন থাকে না। লাশের খবরটা ইতিমধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে ওকে সব কথা আগাগোড়া খুলে বলতে হলো। আমার আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সেই সমস্ত কিছু শোনার পর রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ল স্বরূপ। আমার উপর ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, "তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম দাদা বাড়িটা বিক্রি করে দাও। তুমি তখন আমার কথা শুনলে না। কী দরকার ছিল ওই ভূতুড়ে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার?"

"আমার হয়তো দরকার ছিল না ফিরে আসার। কিন্তু এই হাড়মা খুড়োদের অবস্থাটা একবার ভাব। এরা কার কাছে যাবে? কাকে গিয়ে বলবে নিজেদের দুঃখের কথা?" একটু থেমে আমি আবার বললাম, "একদিন আমারই একটা ভুলের জন্য ওই বিশাই জেগে উঠেছিল। সেই দায় আমি এড়াব কী করে বলতে পারিস? এতগুলো মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে আমি নিরাপদে বাড়িতে বসে থাকতে পারব না ভাই। মরতে হলে এদের সঙ্গেই মরব।"

স্বরূপ তবু মানতে চাইল না, অনেক কথা শুনিয়ে দিলো আমাকে। আপনজনদের এই এক সমস্যা, তারা কিছুতেই কিছু বুঝতে চায় না। আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "তুই চিন্তা করিস না, আর তো ক'টা দিনের ব্যাপার। বিশাইয়ের একটা ব্যবস্থা করেই ছাড়ব।"

"কী আর বলব তোমাকে দাদা, আমার কথা তো তুমি শুনবে না! কিন্তু তুমি কী করতে চাও?"

"বিশাইকে আটকানোর চেষ্টা করব," আমি স্বরূপের প্রশ্নের উত্তরে বললাম। "বিশাই এতদিন দেহধারণ করে ছিল। কাল রাতে আমার সঙ্গে লড়াই হওয়ার পর খুঁতো হয়ে যাওয়ার জন্য ও সেই দেহটা ত্যাগ করে দিয়েছে। সেজন্যই এখন ওকে বাগে পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু বিশাই যখন একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তখন ও কিছুতেই দেহহীন হয়ে থাকতে চাইবে না। ও আবার কাউকে নিজের শিকার বানিয়ে তার শরীরটা দখল করতে চাইবে। আর সেটা আটকানোর চেষ্টা করব আমি। বিশাই যদি আজ রাতের মধ্যে নতুন শরীর ধারণ করতে না পারে তাহলে আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত ওকে অশরীরী হয়েই থাকতে হবে। আর আমি সেই চেষ্টাই করব।"

হাড়মা খুড়ো এতক্ষণ হাঁ করে আমাদের কথা শুনছিল। সব শুনে ভয়ার্ত গলায় বলল, "আবার কাকে মারবেক রে বাপ! এতগুলা লোককে মারেও উয়ার খিদা মিটল নাই?"

"না খুড়ো, বিশাই একবার জাগ্রত হলে সে যে কোনও ভাবে

নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চাইবে। ওর ওই অনন্ত খিদে মিটবার নয়।"

স্বরূপ কৌতূহলী হয়ে বলল, "কিন্তু এই দেহধারণের ব্যাপারটা কী বিক্রম'দা?"

স্বরূপের প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক, এসব জটিল ব্যাপার ওর না বোঝারই কথা। আমি ওদের বিস্তারিত করে সবকিছু খুলে বললাম।

"বিশাই কোনও ভূতপ্রেত নয়, তার নিজস্ব কোনও মৌলিক স্বত্বাও নেই। বিশাই অপতন্ত্রের এক ভয়ংকর শক্তি। সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সিদ্ধ করতে হয়। দ্বিজেন মাহাতর গুরু সেই আদিবাসী তান্ত্রিকই প্রথমে বিশাইয়ের সাধনা করে বিশাইসিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে বিশাইয়ের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তার ভুলেই বিশাইয়ের ওই ভয়ংকর শক্তি তন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে মেরে ফেলে। দ্বিজেন মাহাত ব্যাপারটা জানতে পেরে আবার সেই বিশাইকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা নিজের বশীভূত করে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু উনি জানতেন না যে বিশাই একবার রক্তের স্বাদ পেলে তাকে বন্দি করে রাখাটা প্রায় অসম্ভব। দ্বিজেন মাহাতও বেশিদিন বিশাইকে বন্দি করে রাখতে পারেননি। তাঁর ভুলে বিশাই আবার বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়ে। তবে মুক্ত হলেও দ্বিজেন মাহাত মন্ত্রশক্তির দ্বারা কোনও ভাবে তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পাথর খাদানের কর্মচারিরা ওই জঙ্গলবাড়িতে থাকার সময় বিশাই ফের জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তিনজন মানুষকে মেরে ফেলে।

বিশাইয়ের শক্তি কিন্তু ওই জঙ্গলবাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে আশেপাশের গ্রামে গিয়ে হামলা করার মতো ক্ষমতা তখনও ওর ছিল না। কারণ ওসব করতে গেলে একটা শরীরের প্রয়োজন। বিশাই অশরীরী হওয়ায় এবং তার ক্ষমতা সীমিত হওয়ার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু এতগুলো মানুষকে মেরে তাদের আত্মাগুলোকে নিজের বশীভূত করে ফেলেছিল বিশাইটা। সেই মানুষগুলোর মধ্যে থাকা অতৃপ্ত

বাসনা এবং পৈশাচিক প্রবৃত্তি বিশাইয়ের শক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। তাদের আত্মার মুক্তি না হওয়ার কারণে সেই অতৃপ্ত আত্মাদের সীমাহীন ক্রোধও সঞ্চারিত হয়েছিল বিশাইয়ের মধ্যে। কিন্তু তবুও বিশাই দেহধারণ করতে পারেনি, কারণ সেই সমস্ত হতভাগ্যদের মৃতদেহগুলো যথা নিয়মে দাহ সংস্কার করা হয়েছিল।

জঙ্গলের মধ্যে সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসেছিল বিশাইটা। তারপর একদিন লখিরামের ছেলে বুধন জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বিশাইয়ের খপ্পরে পড়ে যায়। এত বড় সুবর্ণ সুযোগ বিশাই হাতছাড়া করতে পারেনি। বুধনের মৃতদেহটাকে ধারণ করেই বিশাইটা তার তাণ্ডব শুরু করে দেয়। প্রথমে জঙ্গলের পশুপাখিদের মেরেই সে তার খিদে মেটাচ্ছিল, কিন্তু তারপর নিজের শক্তি বৃদ্ধি হতেই গ্রামে গিয়ে হামলা করতে শুরু করে। সাধারণত কোনও জীবিত প্রাণীর টাটকা রক্ত পান করেই বিশাইয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু দেহধারণ করার পর সে ওই প্রাণীদের মাংসও খেতে শুরু করেছিল। কারণ শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তাকে খাবার তো খেতেই হবে। সেজন্য গ্রামে গিয়ে গরু ছাগল হাঁস মুরগি চুরি করতে শুরু করেছিল।

দেহধারণ করে থাকলে ওর সঙ্গে লড়াই করা কঠিন, কারণ অপতন্ত্রের ভয়ংকর শক্তিতে শক্তিমান ওই বিশাইয়ের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা কারওর পক্ষেই সম্ভব নয়। গতকাল রাতে বেকায়দায় পড়ে যাওয়ার ফলে বিশাইটা ওই খুঁতো শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ও চুপ করে বসে থাকবে না, নতুন একটা শরীরের খোঁজে ও আবার গ্রামে গিয়ে হামলা করবে। আজ রাত শেষ হওয়ার আগে ও যদি নতুন কোনও শরীর না পায় তাহলে ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। অশরীরী বিশাইকে মন্ত্রশক্তির দ্বারা বশীভূত করা কঠিন হলেও অসম্ভব কিছু নয়।"

সব শুনে স্বরূপ চিন্তিত মুখে বলল, "তার মানে বিশাইটা আজ রাতেই আবার হামলা করবে। আর তুমি তাকে তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে আটকাতে চাও!"

"একদম ঠিক বুঝেছিস তুই," স্বরূপের কথায় সায় দিয়ে আমি বললাম। "আজ এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমি সমস্ত গ্রামটাকে বন্ধন দিয়ে ঘিরে ফেলব। কোনও রকমে আজকের রাতটা কেটে গেলেই বিশাইয়ের জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে। আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত ও আর কিছুই করতে পারবে না। ওকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য আমিও হাতে বেশ কিছুদিন সময় পেয়ে যাব। এইবার ওকে বাগে পেয়েছি যখন, তখন এই সুযোগ আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না।"

"কিন্তু আশেপাশে তো আরও অনেক গ্রাম রয়েছে বিক্রম'দা। বিশাইটা সে সব গ্রামে গিয়েও হামলা করতে পারে তো?"

"হ্যাঁ, তা অবশ্য পারে। কিন্তু কাঁড়বাঁধি গ্রামটাই জঙ্গলের সব থেকে কাছে। আর তাছাড়া অশরীরী বিশাইয়ের পক্ষে জঙ্গল ছাড়িয়ে খুব বেশি দূরে যাওয়াও সম্ভব নয়। ওর স্মৃতিতে ওই একটা গ্রামই রয়েছে, কারণ এতদিন ও যার শরীরে ভর করে ছিল তার বাড়িও ওই গ্রামেই।"

"বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি সত্যিই ওকে আটকাতে পারবে? যদি তোমার কোনও ক্ষতি করে দেয়!"

আমি জামার ভিতর থেকে মালাটা বার করে স্বরূপকে দেখালাম। "এই দেখ, সাধুবাবার দেওয়া এই মালার জনাই বিশাইটা আমাকে আজ অবধি স্পর্শ করতে পারেনি। তাছাড়া গুরুদেবের আশীর্বাদ রয়েছে আমার সঙ্গে। ওই বিশাই আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক, আমার কিছু হবে না।"

আমার কথা শুনে স্বরূপ কিছুটা আশ্বস্ত হলো বটে, কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা দূর হলো না।

চিন্তা আমারও কিছু কম হচ্ছে না। যতটা সহজ করে ওদের বুঝিয়ে বললাম, ব্যাপারটা অতটা সহজ না-ও হতে পারে। ওই দুর্দান্ত বিশাই এত সহজে হার মেনে যাবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক, কথায় কথায় ঘড়ির কাঁটা কখন যে বারোটার ঘর ছাড়িয়ে গেছে— বুঝতে পারিনি। অবশ্য বাজারে

আমাদের অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল। এটা-সেটা নানান জিনিস কেনাকাটা করতে গিয়ে সময়ের হিসেব ছিল না। এখন দুপুর হয়ে যেতেই আমরা গ্রামে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। কিন্তু স্বরূপ কিছুতেই আমাদের ছাড়ল না। দুপুরের খাবারটা ওর সঙ্গেই খেতে হলো আমাদের। খাওয়া দাওয়া সেরে ওর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আবার জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

২২

গ্রামে ফিরে এসে দেখলাম গোটা গ্রামটা একেবারে খাঁখাঁ করছে। শুনশান ফাঁকা রাস্তা, কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। জিপের শব্দেও কাউকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, বুধনার লাশ উদ্ধার হওয়ার পর গ্রামের সবাই আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। রাস্তায় কাউকে না পেয়ে আমরা সোজা মারাংবুরুর থানে গিয়ে হাজির হলাম। আটচালার মধ্যে কয়েকটা ছেলে বসে বসে গল্প করছিল। আমাদের দেখেই ওরা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো। ওদের মুখেই শুনলাম, পুলিশ এসে বুধনার লাশটাকে তুলে নিয়ে গেছে। গ্রামের কয়েকজন ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় নিয়ে গিয়েছিল, আমরা ফেরার কিছুক্ষণ আগেই তারাও থানা থেকে ফিরে এসেছে। ওদের মুখে সব কথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "শিবু আর শংকর কোথায়?" ছেলেগুলো জবাবে জানাল যে শিবু থানা থেকে ফিরেই শংকরকে নিয়ে জঙ্গলবাড়িতে চলে গেছে, এখনও ওরা ফেরেনি। যাক, একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ওরা জঙ্গলবাড়িতে গেছে, তার মানে বাকি ছেলেগুলোকে নিয়ে বিকেলের আগেই গ্রামে ফেরত চলে আসবে।

জিপ থেকে ব্যাগগুলো নামিয়ে সেগুলো হাড়মা খুড়োকে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি তাহলে জিনিসপত্র সব বের করে পূজার জোগাড় করতে শুরু করে দাও খুড়ো। আমি স্নান-টান করে আসছি।"

রাস্তায় আসার সময়ই খুড়োকে সমস্ত কিছু ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। খুড়ো ব্যাগগুলো নিয়ে মারাংবুরুর থানের দিকে এগোতেই আমি ছেলেগুলোকে বললাম, "তোরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। যারা কাজের জন্য গ্রামের বাইরে গেছে তাদের ডেকে আনার জন্যও লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তোরা সব ব্যবস্থা করতে পারবি তো?" ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জানাল যে ওরা পারবে। ওরা চলে যেতেই আমিও জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এইবার স্নান সেরে আসল কাজ শুরু করে দিতে হবে। হাতে আর খুব বেশি সময় নেই।

গ্রামের উত্তর দিকে একটা তড়ানে পুকুর আছে, সেখানে গিয়ে স্নান সেরে ভেজা কাপড়ে ফিরে এলাম মারাংবুরুর থানে। ততক্ষণে প্রদীপ ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে মারাংবুরুর পূজার জোগাড় শুরু হয়ে গেছে। আমি আসন পেতে বসতেই হাড়মা খুড়ো আমাকে ব্যাগ থেকে সমস্ত উপকরণ বার করে দিলো। আসার সময় ঝালদা থেকে প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমি কিনে নিয়ে এসেছিলাম। আটা, শ্বেতসর্ষপ, আতপচাল, সিঁদুর, কুমকুম ইত্যাদি। হাড়মা খুড়োকে বলতেই পাশের একটা ঝোপ থেকে টাটকা বৈকঙ্কত সমিধ ভেঙে নিয়ে এলো। আমার কথামতো খুড়ো তার বাড়ি থেকে একটা কালো রঙের দেশি মোরগও নিয়ে এসেছে দেখলাম। দ্রুত হাতে পূজার জোগাড় করে নিয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করে তন্ত্রের ক্রিয়া শুরু করলাম।

বিকেল হয়ে আসছে, আর বেশি দেরি করাও যাবে না। সন্ধ্যের আগেই পুরো গ্রামকে বন্ধন করতে হবে। আমি পূজা শুরু করতেই দেখলাম গ্রামের লোকেরা সব দল বেঁধে আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে মারাংবুরুর থানে ভিড় জমে উঠল। হাড়মা খুড়ো উঠে গিয়ে কৌতূহলী জনতার ভিড়টাকে ধমক দিতেই সবাই শান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে শিবু এবং শংকরকেও দেখতে পেলাম, ওরা ইশারায় জানাল জঙ্গলবাড়ির কাজ শেষ করে ওরা নির্বিঘ্নেই ফিরে এসেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি

আমার কাজ করতে শুরু করলাম।

শ্বেতসর্ষপ নিয়ে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে একটা বড় গামলাতে রেখে দিলাম। ওগুলো বন্ধনের কাজে লাগবে। আতপ চালগুলোতে মন্ত্র পড়ে মোরগটার সামনে ছড়িয়ে দিতেই ও সেগুলো খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করল। কুমকুমের তিলক বানিয়ে মন্ত্রপূত করে রাখলাম। বাদুড়ের হাড় এবং কুট্টুরে প্যাঁচার পালক পুড়িয়ে সেই ছাই ছাগলের দুধে গুলে নিয়ে তার মধ্যে সুতোর গোছা ডুবিয়ে দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলাম। ওগুলো কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর মন্ত্রপূত করে সবার হাতে বেঁধে দেবো। বলাই বাহুল্য যে ওই হাড় আর পালক হাড়মা খুড়োই জোগাড় করে এনেছে, ওসব জিনিস বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সব শেষে বৈকঙ্কতের সমিধগুলো নিয়ে তাতে গব্যঘৃত, মধু, আর কর্পূর মাখিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে তার সঙ্গে অল্প গব্যঘৃত মিশিয়ে নিলাম। হাড়মা খুড়োকে ডেকে বললাম ওই কুমকুম এবং বৈকঙ্কত সমিধের ছাই দিয়ে গ্রামের সবাইকে তিলক পরিয়ে দিতে। খুড়ো খুব খুশি হয়ে হাঁকডাক করে সবাইকে ডেকে তিলক দিতে শুরু করল। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কিছুই বুঝল না, কিন্তু খুব হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলো তিলক নেওয়ার জন্য। বড়রাও যে সব বুঝল তা নয় কিন্তু এই সব মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক দেখে ভয়ে হোক বা ভক্তিতে হোক সবাই একে একে এগিয়ে এলো তিলক নিতে।

তিলক পর্ব চলছিল সেই সময় শিবু আর শংকরকে ডেকে নিলাম, ওদের হাতে শ্বেতসর্ষপের গামলাটা ধরিয়ে বললাম গ্রামটাকে বেড় দিয়ে গণ্ডির মতো করে ছড়িয়ে দিতে। পাঁচকেজি আছে, শিবুদের গ্রাম খুব বড় নয়, ঠিক কুলিয়ে যাবে। ওরা চলে যেতে মোরগটার দুটো পা বেঁধে থলের মধ্যে ভরে নিলাম। এতক্ষণ মনের সুখে আতপচাল খাচ্ছিল মোরগটা, ধরতেই 'কোঁ কোঁ' করে ডানা ঝাপটে ভয়ানক শোরগোল জুড়ে দিলো। এতগুলো জীবন বাঁচানোর জন্য একটা জীবনকে উৎসর্গ করাই যায়। দেখা যাক কী হয়। আমার আন্দাজ ভুল হলে হয়তো বেচারা মোরগটিকে মরতে

হবে না। হে ভগবান, তাই যেন হয়।

শিবুরা দলবল নিয়ে সমস্ত গ্রামটার চারিদিকে ঘুরে শ্বেতসর্ষপ ছড়িয়ে খালি গামলাটা নিয়ে ফিরে এলো। ওরা ফিরে আসার পর আমি একটু আশ্বস্ত হলাম, বিশাই আর কোনও ভাবেই গ্রামের কাউকে তার শিকার বানাতে পারবে না। সারা গ্রাম মন্ত্রপূত শ্বেতসর্ষপ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ কোনও কারণে রাতের বেলায় গ্রামের বাইরে যায় তার জন্য তিলকও দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের হাতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রপূত সুতো। এবার আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। আজকের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আজ রাতের মধ্যে বিশাই যদি কাউকে তার শিকার বানাতে না পারে, তাহলে আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত তাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হবে।

শরীর ধারণ না করতে পারলে বিশাইয়ের আর কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। তবে চিন্তাও হচ্ছে, বিশাইও নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তেই এগোচ্ছে। লড়াই এত সহজে শেষ হয়ে যাবে, এটা কেন জানি না কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফুরফুরে মেজাজে জিপ চালিয়ে জঙ্গলবাড়িতে ফিরছিলাম। শিবুর কল্যাণে আজও খাওয়া-দাওয়া ব্যাপকভাবেই হয়েছে। বলতে লজ্জা নেই যে আমি ভীষণ পেটুক। পছন্দমতো খাবার পেলে রাক্ষসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি। শিবু রাঁধেও বড় চমৎকার। বুনো খরগোশের মাংসটা যা রেঁধেছিল তাতে ওর হাতটাকেই যে কামড়ে খেয়ে ফেলিনি এই ওর ভাগ্যি। খাওয়া-দাওয়ার পর বটতলায় গল্পে মজেছিলাম আমরা ক'জন, ওই করতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। তাতে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই, ভৈরব পাশে থাকতে কোনও কিছুর ভয় আমি পাই না। পাশের সিটেই ভৈরব গাঁট হয়ে বসে আছে, ও নিজেও কিছু কম খায়নি শিবুর বাড়িতে।

সেই সকালের পর থেকে একটাও সিগারেট খাওয়া হয়নি, ধোঁয়ার জন্য মনটা ছটফট করছিল। গ্রামের জঙ্গলটা ছাড়িয়ে

ঢালে নেমে পাথর খাদানের মুখে একটা বাঁকের কাছে জিপটাকে দাঁড় করালাম। দাঁড়াতেই গাড়ির ঝাঁকুনিতে পিছনের সিটের নীচে থলের মধ্যে রাখা মোরগটা বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল। ওটার কথা মনেই ছিল না বলে ভীষণ চমকে উঠলাম। এই শুনশান ফাঁকা প্রান্তরে ওই মোরগটাও কম ভয়ংকর নয় দেখছি। কথাটা মনে হতেই হাসি পেয়ে গেল। অবশ্য গতকাল রাতে যা ঘটেছে তাতে ভয় পাওয়ারই কথা। ড্যাশবোর্ডের থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আহহ, এতক্ষণে শান্তি!

সিগারেটে কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে আবার যাত্রা শুরু শুরু করলাম। সামান্যই রাস্তা বাকি আছে আর। পাথর খাদানের চড়াই টপকে ফাঁকা মাঠটা পেরিয়ে গেলেই তো জঙ্গলবাড়ি পৌঁছে গেলাম। বিশাইয়ের জ্বালায় পরপর দু'রাত ভালো ঘুম হয়নি, আজ হয়তো শান্তিতে ঘুমোতে পারব। আজ সেরকম কুয়াশা নেই, কিন্তু ঠান্ডা বাতাস বইছে খুব। এই ফাঁকা প্রান্তরে কনকনে উত্তুরে হাওয়া যেন জামা-প্যান্ট ফুঁড়ে ভিতর পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে। আকাশের তারাগুলোও আজ খুব স্পষ্ট। এক আকাশ তারার নীচে এই ফাঁকা প্রান্তরে খোলা জিপে বসে আমি যেন কোনও অন্য দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যিই এ এক অনন্য অনুভূতি! এরকম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য সবার হয় না। সামনে গভীর জঙ্গল তার মধ্যে মিশে থাকা হাজার রহস্যের পসরা সাজিয়ে অন্ধকারে ডুবে আছে আমার মতো কোনও অন্ধকারের যাত্রীর অপেক্ষায়। যে পরিবেশের কথা কল্পনা করলেও আতঙ্কে শরীরে শিহরণ বয়ে যায়। সেই পরিবেশে উপস্থিত থেকেও তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করছি কীভাবে, সেটা ভেবেই অবাক হয়ে গেলাম। আজ বুঝতে পারছি, কেন মানুষ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বারবার মৃত্যুর দিকে ছুটে যায়। মৃত্যুর সেই ভয়াবহ রূপের প্রেমে যে পড়েছে, একমাত্র সে-ই জানে ভয়ের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে পাগল করে দেওয়ার মতো সৌন্দর্য। আজ বুঝতে পারছি কেন গুরুদেব বলতেন যে আমরা মৃতের পৃথিবীতে বাস করি। মানুষ তুচ্ছ কারণে ভয় পেতে পেতে প্রতিদিন একটু একটু করে মরতে থাকে। জীবিত তো সে-

ই, যে বিপদের মধ্যেও হাসিমুখে ছুটে যায় মৃত্যুকে ভালোবেসে। ভয়কে জয় করতে পারলেই পাওয়া যায় অমরত্বের সন্ধান।

জঙ্গলবাড়ির গেট দিয়ে ঢোকার সময় ভৈরব হঠাৎ যেন কিছুর আভাস পেয়ে কান খাড়া করে সিটের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝোপঝাড়গুলো কেটে দেওয়াতে জিপের তীব্র আলোয় চারিদিক একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আমার চোখে সন্দেহ জনক কিছুই ধরা পড়ল না। জিপটাকে উঠোনের আমগাছটার নীচে দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম। পিছনের সিটের তলা থেকে সেই মোরগের থলেটা বার করতেই সেটা আবার বিশ্রী ভাবে ডেকে উঠল। চারপাশটা একবার ভালো ভাবে দেখে নিয়ে আমগাছের একটা নিচু ডালে থলেটা ঝুলিয়ে দিলাম। এই মোরগটাই আজ আমার তুরুপের তাস। ওর জীবনের বিনিময়েই হয়তো আজ এতদিনের সমস্যার সমাধান ঘটতে চলেছে। হয়তো এই মোরগটার জন্যই আজ আমি আমার অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যাব। থলেটা ঝুলিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম ভৈরব টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে বাড়িটার পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। তাহলে কি আমি যা ভাবছি তাই ঠিক!

ভৈরবকে বিশ্বাস নেই, এখুনি হয়তো ছুট লাগাবে অন্ধকারে। তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বারান্দার গ্রিলের দরজাটার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, আজ কিছু ঘটবে। ভৈরবকে কোল থেকে নামিয়ে দরজাটা আবার তালাবন্ধ করে দিলাম। আজ আর কোনও ঝুঁকি নেব না। অবশ্য কালকের ওই ঘটনার পর সেই সাহসও আর আমার নেই। কাল যেভাবে পাথর ছুঁড়ে আমাকে জখম করেছিল তাতে ঘরের বাইরে থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। অশরীরী বিশাই নিশ্চয়ই আমার উপর নজর রাখছে। আমার ছোট্ট একটা ভুল, ব্যস গেল খতম!

ঘরের দরজাটার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দরজাটা আঁচড়াতে শুরু

করে দিলো ভৈরব। কেন জানি না ও বারবার বাইরে বেরোতে চাইছে, কিছুতেই ঘরের মধ্যে থাকতে চাইছে না। ঘরের দরজাটা বন্ধ করলাম না, শুধু ভেজিয়ে রেখে নিঃশব্দে কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে দরজার কাছেই বসে পড়লাম। এইবার শুরু হবে অপেক্ষা। ভিতর থেকেই শুনতে পাচ্ছি বাইরে আমগাছের ডালে টাঙানো থলের মধ্যে বন্দি মোরগটা থেকে থেকে কঁকিয়ে উঠছে। হে ঈশ্বর, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অবলা এই প্রাণীটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। যে সন্দেহটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি মোটেই ভুল পথে হাঁটছি না।

২৩

জানি না অপেক্ষা করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল। অপেক্ষা কখনওই সুখকর হয় না তাই এক মিনিটকেও মনে হচ্ছিল যেন একঘণ্টা। হঠাৎ ভৈরব তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল। আমি টর্চটা নিয়ে রেডি হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই উত্তরের সেই জানালার ওদিক থেকে একটা অদ্ভুত গোঁঙানির শব্দ ভেসে এলো। কেউ যেন 'উঁউঁউঁ উঁউঁউঁ' করে কাঁদছে।

স্পষ্ট মেয়েলি গলায় কেউ হাহাকার করে কাঁদছে। কান্নার আওয়াজটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দেওয়ালের ওপাশ থেকে। শব্দটা বাড়ির পিছন দিক থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে বাড়িটার পাশ দিয়ে ঘুরে আসছে সামনের দিকে। উত্তরের জানালার ওদিক থেকে ঘুরে পশ্চিমের জানালার দিকে আওয়াজটা ঘুরে যেতেই দরজার হাতলটা ধরে প্রস্তুত হলাম। দেওয়ালের ওপাশে যে কাঁদতে কাঁদতে হেঁটে যাচ্ছে সে কি শরীরী, নাকি অশরীরী।

ভীষণ উত্তেজনায় আমার পুরো শরীরটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। মনে মনে একবার গুরুদেবকে স্মরণ করে নিলাম। দেখতে দেখতে কান্নার শব্দটা পশ্চিমের জানালা ছাড়িয়ে সামনের

বারান্দাটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল উঠোনের দিকে। পরমুহূর্তেই মোরগটার মর্মান্তিক চিৎকারে বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। চোখের পলকে দরজাটা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে টর্চের আলো ফেললাম আমগাছটার দিকে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো কোনও মাঝবয়েসী শীর্ণকায়া মহিলা দুদ্দাড় করে ছুটে ঘরের পিছন দিকে পালিয়ে গেল। ভৈরব ভীষণ হুঙ্কারে লাফিয়ে পড়ল গ্রিলের দরজাটার উপর, যেন এখুনিই দরজা ভেঙে ধাওয়া করবে ওই মহিলাটিকে। জোর করে ওকে ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

হে ভগবান! আমার সন্দেহটাই সত্যি হলো তাহলে। এই জন্যই বিশাই দেহমুক্ত হয়েছিল! আমার এত পরিশ্রম, এত খরচ সব বেকার হয়ে গেল।

প্রচণ্ড রাগে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম। বিশাইটা যেন ইচ্ছে করেই আমার সঙ্গে এরকম মশকরা করতে শুরু করেছে। অবশ্য ভুলটা আমারই, আমিই হিসেবে ভুল করেছিলাম। বুঝতে পারলাম, সেই পুরোনো রাগটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। বিশাইয়ের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা ছিল না, শত্রুতা থাকার কথাও নয়। ভুল আমাদের হয়েছিল, কিন্তু সেই ভুল আমরা সজ্ঞানে করিনি। সম্পূর্ণ অজান্তে করা সেই ভুলের মাশুল হিসেবে আমার প্রিয় বন্ধু রাজাকে মরতে হয়েছে। সারা জীবনের জন্য বদনামের ভাগী হতে হয়েছে আমাকে। রাজার পরিবার আমাকে আজও ক্ষমা করতে পারেনি। আমি নিজেও ক্ষমা করতে পারিনি নিজেকে। সেই পাপবোধের যন্ত্রণা থেকেই ফিরে এসেছিলাম এখানে, যাতে সামনা-সামনি বিশাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে পারি। কিন্তু প্রথম থেকেই বিশাই আমাকে যেভাবে লেজে খেলিয়েছে তাতে নিজের মেজাজ ঠিক রাখাটাই কঠিন হয়ে পড়ছিল। তবে এত সমস্যার মধ্যেও একটা ভালো ব্যাপার ঘটেছে। আমার সন্দেহ একটা হয়েছিল, সেজন্য মোরগের টোপটা দিয়েছিলাম বিশাইকে ফাঁদে ফেলার জন্য। খুশির কথা এই যে ও সেই ফাঁদে পা দিয়েছে। আজ আর রাত জেগে লাভ নেই, কাল থেকে অনেক কাজ করতে

হবে। লম্বা একটা ঘুম আমার ভীষণ প্রয়োজন।

বিছানাটা ঝেড়ে নিয়ে শুতে যাব ঠিক তখুনি উত্তরের জানালার ওপাশ থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ভেসে এলো, আর তারপরই যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল দেওয়ালের ওপারে। ভৈরব আবার চিৎকার করে ডেকে উঠতে গিয়েও কী ভেবে চুপ হয়ে গেল। মনে মনে হেসে উঠলাম আমি, এতক্ষণে বিশাই জব্দ হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিতেই ওপাশ থেকে কেউ যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল। যত খুশি ধাক্কাধাক্কি করুক এবার, আর ওকে ছাড়ছি না। এইবার প্রতিশোধের পালা।

বিছানার চাদরটা ঝেড়ে নিয়ে সমান করে পেতে আমি শুয়ে পড়লাম। এইবার গা ভরে চমৎকার ঘুম আসবে। বিশাই আমার ফাঁদে পড়েছে, ওকে সহজে ছেড়ে দেবো না। যতটা কষ্ট ও রাজাকে দিয়েছে, যতটা যন্ত্রণা কাঁড়বাঁধি গ্রামের মানুষদের দিয়েছে তার সুদে আসলে হিসেব নিয়ে ছাড়ব। মারাংবুরুর থানে মোরগটাকে মন্ত্রপূত আতপচাল খাইয়ে দিয়েছিলাম। সেই মোরগটাকেই খেয়েছে বিশাই। আর তার ফলে ও বরাবরের জন্য বন্দি হয়ে গেল ওই মহিলার শরীরে। এখন চাইলেই ও আর দেহমুক্ত হতে পারবে না। পড়ে থাক এখন ওই অন্ধকূপে। জানালার ওদিকে সেই গর্জন আর আর্তনাদ তখন বিলাপে পরিণত হয়েছে। সেই বীভৎস বিলাপ শুনলে বড় বড় সাহসীরও বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবে। গভীর জঙ্গলের ভিতর এই রকম একটি বাড়িতে শুয়ে সেই বিলাপ শোনার মতো হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা তো আর সবার কপালে জোটে না!

সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছিল, শুধু প্রমাণ ছিল না কিছু। শিবুদের কাছে শুনেছিলাম, গ্রামের এক পাতাকুড়ানি মহিলা এবং একটি জোয়ান ছেলে জঙ্গলে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে লাশগুলো গেল কোথায়? লাশ যখন পাওয়া যায়নি তার মানে বিশাই দেহধারণ করেছে। তারপর যখন বিশাইকে প্রথম দেখলাম তখনই বুঝেছিলাম যে ছেলেটার

শরীরে আশ্রয় করেছে বিশাইটা। কিন্তু তাহলে ওই পাতাকুড়ানি মহিলাটির লাশের কী হলো? তাছাড়া বিশাই তো মাংস খায় না, নিজের শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে শুধু টাটকা রক্ত পান করে। কিন্তু শংকরদের মোষের বাছুরের আধখাওয়া লাশ দেখে আমার সন্দেহটা বেড়ে যায়। এবং আজ সেটা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল। কিন্তু দু' দুটো লাশকে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রাখাও তো সম্ভব নয়। অথচ বিশাইটা তার জন্যও সহজ রাস্তা বার করে নিয়েছিল। যাই হোক, বিশাইকে ওই মহিলার শরীরের মধ্যে বন্দি করতে পেরেছি যখন, তখন বাকি কাজগুলোও নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। এখন শুধু বিশাইকে ওই অন্ধকূপের মধ্যেই আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ও আবার বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের রক্তপিপাসা মেটাতে না পারে। ওই অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে পড়ে ও ছটফট করবে কিন্তু বাইরে বেরোতে পারবে না। আবার দেহমুক্ত হয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতেও পারবে না। রাজার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আমি ওকে দগ্ধে দগ্ধে মারব। উফফফ, কতদিন পর আজ শান্তিতে ঘুমোতে পারছি! বিশাইয়ের মর্মান্তিক বিলাপ এখন আমার কাছে যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতোই মনে হচ্ছিল। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে বিছানায় শুতে না শুতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য স্নান-টান সেরে একেবারে তৈরি হয়ে গেলাম। আজ জঙ্গলে যাব কয়েকটা বিশেষ জড়িবুটির সন্ধানে। কাল রাতে গ্রাম থেকে ফেরার সময় শিবু, শংকরকে বলেছিলাম আজ সকাল সকাল যেন জঙ্গলবাড়িতে চলে আসে। কিন্তু ওরা এখনও এসে পৌঁছয়নি। কাল রাত্রে বেশ ভালোই মহুয়া টেনেছিল দু'জনে, সেজনাই হয়তো এখনও ঘুম থেকে উঠতে পারেনি। স্টোভ জ্বালিয়ে একটু চা বানিয়ে নিয়ে উঠোনের একফালি রোদের মধ্যে বসে পড়লাম। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। ওদের তো এতক্ষণে চলে আসার কথা, ব্যাটারা এত দেরি করছে কেন কে জানে! গ্রামে আর কোনও

অঘটন যে ঘটবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, তাহলে...

আগের কয়েকটা রাত ভালো ঘুম হয়নি, কিন্তু কাল রাতে চমৎকার ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে শরীর মন দুই-ই বেশ ঝরঝরে লাগছে। ভৈরবও এতক্ষণ দিব্যি খোশ মেজাজে উঠোনের চারিদিকে শুঁকতে শুঁকতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কুকুরদের এই স্বভাবটা ভারি অদ্ভুত, যা-ই দেখতে পাক সেটাই আগে শুঁকে দেখতে হবে। আমাকে চা নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ভৈরব, ওরও চা বিস্কুট চাই। ওর জন্য বরাদ্দ চা আর বিস্কুট দিতেই ভৈরব মহানন্দে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লেগে পড়ল। দূরে কোথাও গাছের আড়ালে একটা ঘুঘুপাখি খুব উত্তেজিত হয়ে ডাকাডাকি করছিল। হয়তো ওর সঙ্গীকে ডাকছে। জঙ্গলটা ধীরে ধীরে আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠছে দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

চা শেষ করে গ্লাস ধুয়ে ঘরের মধ্যে রেখে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলাম গেটের কাছে শিবু আর শংকর কাঁধে তিরধনুক নিয়ে রাম-লক্ষনের মতো হেঁটে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে দূর থেকেই হাত তুলে জোহার জানাল, আমিও উত্তরে জোহার জানালাম। এই জন্যই তাহলে দেরি হলো ওদের। জঙ্গলে যাবার কথা শুনেই ওরা শিকারের প্ল্যান করে নিয়েছিল। যদিও দেশের আইন অনুযায়ী বন্যপ্রাণী শিকার এখন নিষিদ্ধ, কিন্তু ওদের সেটা কে বোঝাতে পারবে। অবশ্য বুঝিয়ে লাভও কিছু নেই, ওদের নিজস্ব যুক্তি আছে। ওরা সেই আদিমকাল থেকে জঙ্গলের অধিবাসী। পুরুষানুক্রমে এই জঙ্গলে ওরা শিকার করে আসছে। আর তাছাড়া ওরাই তো এই জঙ্গলটাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে এতদিন। ওরা জানে কীভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। যতদিন এইসব জঙ্গল পাহাড় ওদের হাতে ছিল, ততদিন কোনও সমস্যা ছিল না। সভ্য মানুষের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকেই সমস্ত সমস্যার শুরু। এই সভ্য মানুষেরাই নিজেদের স্বার্থে জঙ্গল কেটে, জীবজন্তুদের মেরে জঙ্গল পাহাড় সব ধ্বংস করে দিয়ে এখন আইন বানিয়ে প্রকৃতি রক্ষার নাটক শুরু করেছে।

অবশ্য কথাগুলো মিথ্যে নয়, ওদের যুক্তির সামনে আমাকে হার মানতেই হয়। তাছাড়া তাতে আমার কোনও লোকসান নেই। ওরা যা-ই শিকার করুক তার ভাগ আমাকেও দেবে। আর শিবুর হাতে রান্না করা শিকারের মাংসে, উফফফ! ওদের বোঝাতে গিয়ে সেই স্বর্গীয় স্বাদে বঞ্চিত হওয়ার মতো মুর্খামি আমি অন্তত করতে পারব না।

শিবুদের দাঁড় করিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। জিন্স আর বেগুনি রঙের টিশার্ট গায়ে দিয়ে জুতো পরে যখন বেরিয়ে এলাম, আমাকে দেখে শিবু আর শংকর হাঁ হয়ে গেল। ঘরে তালা লাগিয়ে আমরা তিনমূর্তি জঙ্গলের পথে বেরিয়ে পড়লাম। ভৈরবও মহানন্দে লাফাতে লাফাতে আমাদের সঙ্গে চলল।

২৪

জঙ্গলের এদিকটায় অনেক দিন কেউ না আসাতে ঝোপঝাড়ে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। বড় বড় শাল, মহুয়া, কেঁদ, হরীতকী, বহেড়া, গামার, অর্জুন, শিমুল, পলাশ গাছের ছায়ায় এমনিতেই এদিকটা অন্ধকার হয়ে থাকে। তার উপর এইসব ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠে জঙ্গলের রাস্তা একেবারে দুর্গম হয়ে উঠেছে। বেগতিক দেখে শিবু একটা লাঠি দিয়ে ঝোপগুলোকে সরিয়ে রাস্তা বানাতে শুরু করল। ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর আমরা ছোট ডুংরিটার কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার কিছু বিশেষ জড়িবুটি প্রয়োজন। লখিরাম খুড়োর বউয়ের চিকিৎসায় সেসব কাজে লাগবে। তাছাড়াও বিশাইয়ের জন্য যেসব তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করতে হবে তার জন্যও কিছু শেকড়বাকড়, সমিধের প্রয়োজন। এই ডুংরিটার আশেপাশের জঙ্গলে ভেষজ গাছগাছড়ার ছড়াছড়ি। হাড়মা মাঝি আমাকে এখানেই নিয়ে এসে গাছপালা চেনাতো।

ডুংরির নীচে পৌঁছে একটা হরীতকী গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। ভাঙা পা নিয়ে এতদূর হেঁটে আসা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! এবড়ো-খেবড়ো চড়াই রাস্তায় হেঁটে আমি দরদর করে

থামতে শুরু করেছিলাম। বহুদিন অনভ্যাসের ফলে এরই মধ্যে হাঁফ ধরে গেছে। শিবু বা শংকরের কাছে অবশ্য এসব কোনও ব্যাপারই নয়। ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। ভৈরব তো আনন্দে লাফ দিয়ে দিয়ে ঘুরছিল চারিদিকে, ওর পায়ের চোট এই ক'দিনে একটু ভালো হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। শিবু আমার হা-ক্লান্ত অবস্থা দেখে হেসে বলল, "পণ্ডিত, তুই বুড়হা হয়ে গেলিস যে রে। ইত্তুটুকু আসেই হাঁফাই গেলি!" তারপরই গলাটা নামিয়ে বলল, "তুই শংকর্যাকে লিয়ে তুর শিকড়-পালা খুঁজ, আমি চললি। দেখি খাওয়ার লাগ্যে কিছু পাই কিনা।" বলেই তিরধনুক নিয়ে শিবু পাশের জঙ্গলটার দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বসে থেকে একটু সামলে নিয়ে আমিও এবার প্রস্তুত হলাম ডুংরিতে ওঠার জন্য। শংকর গম্ভীরমুখে পাশেই একটা বড় পাথরের উপর বসে ছুরিতে শান দিচ্ছিল। আমাকে উঠতে দেখে ছুরিটাকে থলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলো। বলল, "দেখবি পণ্ডিত, শিবা একদিন সাপের ডাসানিতেই মরবেক।"

হেসে ফেললাম ওর কথা শুনে। শিবু ওকে সঙ্গে না নিয়ে একাই শিকারে চলে গেল বলে ওর রাগ হয়েছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম, "তাহলে তো তোরও উচিত ওকে সাপের হাত থেকে বাঁচানো। হাড়মা মাণ্ডির ছেলে হয়ে বন্ধুকে সাপের হাতে মরতে দিবি?"

শংকর হেসে ফেলল। বলল, "না থাক, চল আগে তুর জড়িবুটি গুলান খুঁজে বার করি। আসেছি যখন, তখন শিকার না নিয়ে তো আর ফিরব নাই।"

তা অবশ্য ঠিক, ওরা খালি হাতে ফিরে যাবার মতো ছেলে নয়। জঙ্গলে যখন এসেছে তখন ছোট বড় যাই হোক শিকার ওরা করবেই। একসময় এই পাহাড় জঙ্গলে ওদের সঙ্গে আমিও দাপিয়ে শিকার করেছি। বুনোমুরগি, বুনোশুয়োর, সজারু, হরিয়াল, তিতির, বটের, ঘুঘু, খটাশ, গোসাপ, হরিণ— কত কী না শিকার করা হতো। তবে সেটা বছরে মাত্র একটা দিন, শিকার পরবের সময়। আদিবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী গোর্গাবুরুর রাজ্যে

ওই একদিন মাত্র আদিবাসীরা শিকার করতে পারবে। বর্তমানে দেশের আইন বন্যপ্রাণী শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তবুও চোরাগোপ্তা শিকার তো চলতেই থাকে। আইনের তো নিজের চোখ-কান নেই, আইনের যারা চোখ-কানের কাজ করে তারাই যদি সবকিছু দেখে শুনে চুপচাপ থাকে তাহলে আর কার কী করার আছে। অবশ্য একা কেউ এসব ভেবে কিছুই করতে পারবে না। মানুষ তো সেই আদিকাল থেকেই প্রকৃতিকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। প্রকৃতির জন্য আসলে কেউ ভাবে না, ওসব শুধু বইয়ে পড়ার জন্য।

একবোঝা শেকড়বাকড় জোগাড় করে যখন ডুংরি থেকে নীচে নেমে এলাম তখন খিদের চোটে পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। ভয়ানক রকম তেষ্টাও পেয়েছে, কিন্তু আসার সময় সঙ্গে করে জলের বোতল আনতেই ভুলে গেছি। ঘড়িতে দেখলাম সবে সাড়ে দশটা বেজেছে। ফিরে যেতে আরও ঘণ্টা দুই লেগে যাবে। এতক্ষণ তেষ্টা নিয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব। শংকরকে বললাম, "হ্যাঁ রে, এদিকে একটা ঝরনা ছিল না? খুব তেষ্টা পেয়ে গেছে ভাই, সঙ্গে তো জলও নেই।"

শংকর অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ আছে তো, মারাংবুরুর নহর। ইয়ার মধ্যেই ভুলে গেলি! তুই সত্যিই দিকু হয়ে গেছিস।" বলেই হেসে ফেলল শংকর। "চল, তোকে আবার সব চিনাই দিচ্ছি।"

শংকর আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ঝরনাটার দিকে। ভৈরব আমাদের আগে আগে এমনভাবে ছুটে যাচ্ছিল যেন এসব পথঘাট ওর কতদিনের চেনা। ঝরনা মানে সেরকম বড়সড় কিছু নয়, ডুংরির ওপাশে পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে পাথরের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা পাতালের জল। কিন্তু সেই জল বড় সুস্বাদু, বড় হজমি।

ডুংরিটাকে বাঁদিকে রেখে জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা হাঁটতেই সব কিছু আবার মনে পড়ে গেল। এই পাহাড়ের মধ্যেই আদিবাসীদের একটা বস্তি ছিল বহুকাল আগে। ওটাই নাকি ছিল পাহাড়ের দেবতা

গোর্গাবুরুর রাজ্য। শংকরদের গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেছি, তারা আগে সেই গোর্গাবুরুর রাজ্যের প্রজা ছিল। তখন দিকুরা এভাবে সব কিছু দখল করে নেয়নি। জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদেরই রাজত্ব চলত। সেই সব নিদর্শন কিছু এখনও আছে এদিকের জঙ্গলের মধ্যে। ছোট একটি গুহার মধ্যে ছিল আদি মারাংবুরুর থান। তার আশ্রয়ে আদিবাসীরা এখানে সুখে শান্তিতে থাকত। কিন্তু তারপর একদিন জঙ্গলে নেমে এলো গোর্গাবুরুর অভিশাপ। আগুন লেগে জঙ্গল পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কত জীবজন্তু পাখি পুড়ে মারা গেল সেই বিধ্বংসী আগুনে। মারাংবুরু আগে থেকেই আদিবাসীদের রাজাকে স্বপ্ন দিয়ে সব কিছু জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য ওরা সময় থাকতে পালিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তারপর মারাংবুরুর হুকুমে ওরা এই জঙ্গল পাহাড়ের বাইরের দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করে। ওদের সেই পূর্বপুরুষেরা এখান থেকে মারাংবুরুকে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার প্রতিষ্ঠা করে নতুন গড়ে ওঠা বস্তিতে। এই কাহিনিগুলো কতটা সত্যি জানি না, কিন্তু এদিকের জঙ্গলের ভিতর খুঁজলে এখনও আগেকার সেই বস্তির অনেক প্রমাণ মেলে।

ঝোপঝাড় ঠেলে ডুংরিটার পিছনে পৌঁছে দূর থেকে সেই মারাংবুরুর গুহাটাকে দেখতে পেলাম। শংকর দূর থেকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিলো, দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম। আমি মনে করি মানুষের ভক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস, তাঁর নাম গোত্র হয় না। হতে পারে তাঁর উপাসনার পদ্ধতি আলাদা, হতে পারে তাঁকে অন্য নামে ডাকা হয়। কিন্তু ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন, তাঁর মধ্যে সত্যিই কোনও ভেদ নাই। প্রণাম সেরে আমরা দ্রুতপায়ে গুহাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ওই গুহার ভিতরেই আছে প্রাকৃতিক সেই ঝরনা। পাথরের ফাটল দিয়ে সুমিষ্ট পাতালের জল উঠে এসে ছোট নালার আকারে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বড় বড় ফার্ন আর নাম না-জানা জলজ গাছের জঙ্গল হয়ে রয়েছে নালাটার দু'ধারে। লোকজনের যাতায়াত নেই বলে গুহার মুখটাও ঝোপে ঢাকা পড়েছে। শংকর ওদিকে গটগট

করে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ওকে মানা করলাম। এদিকে লোকজন বিশেষ আসে না, গুহার মধ্যে ভাল্লুক বা হায়েনার বাসা থাকতেই পারে। দু'জনে সন্তর্পণে এগোনো শুরু করতেই হঠাৎ পিছনদিক থেকে 'হাঃ হাঃ' করে কারও হাসির শব্দ ভেসে এলো। চমকে ফিরে তাকিয়েই দেখলাম নালাটার ওধারে একটা বড় মহুয়া গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে শিবু। উফফ, কি শয়তান! পুরো চমকে দিয়েছিল একদম।

লাফ দিয়ে নালাটা ডিঙিয়ে আমাদের দিকে এগোতে এগোতে শিবু বলল, "ভয় নাই রে, আমি আগেই দেখে লিয়েছি সব। কিছু নাই ভিতরে। লিশ্চিন্তে জল খাবি যা।"

শিবু কাছে আসতেই দেখতে পেলাম ওর হাতে বুনো লতায় বাঁধা দুটো বনমুরগি ঝুলছে। ভালোই শিকার জুটেছে তাহলে। আমার অবাক ভাব লক্ষ করে শিবু চোখ নাচিয়ে বলল, "জলদি জল খায়ে আয়, উদিকে একটা বরাও পড়ে আছে ঝুপের মধ্যে। একা একা আর বইতে পারি নাই।"

আরেব্বাপ রে! বরা মানে বনশুয়োরও মেরে দিলো এই কিছুক্ষণের মধ্যে! ধন্য শিকারি বটে শিবু। তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে পাথরের কুণ্ডের ভিতর থেকে আঁজলা ভর্তি করে জল খেলাম। আহহহ, শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। প্রকৃতি আমাদের তৃপ্তির জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করে রেখেছে, তবু আমরা ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্য প্রতিদিন এই প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করে চলেছি। আমরা বলি ঘুণ বা উইপোকা লেগে ঘরের আসবাব নষ্ট হয়, ভাইরাস ঢুকে আমাদের শরীরে রোগজ্বালা সৃষ্টি করে। এক একবার আমার মনে হয় মানুষের থেকে বড় ঘুণপোকা বা ভাইরাস এই পৃথিবীর জন্য আর কিছু নেই। আমরা মানুষেরা যেভাবে এই সুন্দর সাজানো গোছানো পৃথিবীটাকে প্রতিদিন তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি তাতে আমাদের থেকে বড় ভাইরাস আর কী হতে পারে। মানুষের জন্যই আজ জল মাটি বাতাস দূষিত হয়েছে। শুধু কি তাই! দূষিত হয়েছে সমাজ, মানুষ এবং মনুষ্যত্ব। কথাগুলো মনে হতেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই তো, আমরাই তো দায়ী

এই সব কিছুর জন্য।

জল খাওয়া হলে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আবার শেকড়ের বোঝাটা কাঁধে তুলে নিলাম। শংকর শিবুর সঙ্গে ওদিকের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা বরাটাকে তুলে আনতে গেল। বরাটা এই নালায় জল খেতে এসেছিল, দূর থেকে দেখতে পেয়েই তির ছুঁড়ে মেরেছিল শিবু। ওর অব্যর্থ লক্ষ্য, এক তিরেই হৃৎপিণ্ড ভেদ করে ধরাশায়ী করেছিল বরাটাকে।

ওরা দু'জনে বরাটাকে তুলে আনার জন্য চলে যেতেই আমি একা একাই ডুংরিটার সামনের দিকে এগোতে শুরু করলাম। ভৈরব আমার সঙ্গেই ছিল অবশ্য। কিছুদূর গেছি এমন সময় দূর থেকে হাতির ডাক কানে এলো। আওয়াজ শুনে বুঝলাম, ডুংরির সামনের দিকে হয়তো হাতির পাল এসে হাজির হয়েছে। এদিকে কাছেপিঠে এই ঝরনার জলের নালাটা ছাড়া আর কোথাও জল পাওয়া যায় না। হাতিগুলো হয়তো জল খাওয়ার জন্য এদিকেই আসছে। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে সরে গেলাম গাছের আড়ালে। তেমন বুঝলে ডুংরির গা বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাব। জংলী হাতি বিশাইয়ের থেকে অনেক বেশি ভয়ংকর! ওদের সামনে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু শিবু আর শংকর তো নালাটার ওদিকেই আছে। যদিও ওরা জঙ্গলের সন্তান, জঙ্গলের ঘাঁতঘোত সবই ওদের জানা, তবুও হাতির কথাটা ওদের জানিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে ফিরে যেতে চাইলে হাতির দল রাস্তাতেই আমাকে ধরে ফেলবে।

হঠাৎ খেয়াল করলাম ভৈরব নেই, এদিক ওদিক তাকাতে দেখি ও লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে ঝরনাটার দিকে। যাক বাবা, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ওর হাঁকডাকে শিবুরা সতর্ক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আমিও ডুংরির একটু উপরের দিকে উঠে একটা হরীতকী গাছের আড়ালে গুছিয়ে বসলাম। দেখতে দেখতে হাতির পালটা ডুংরির নীচে চলে এলো। খুব বড় দল নয়, সব মিলিয়ে দশ বারোটা হাতি। লিডার গোছের দাঁতাল হাতিটা আগে আগে শুঁড় দুলিয়ে হেঁটে আসছিল। দলের মধ্যে একটা বাচ্চাও আছে দেখছি।

বাচ্চাটাকে দেখে খুব মজা পেলাম। বড়দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে না পেরে বারবার পিছিয়ে পড়ছিল, তারপর ভয় পেয়ে আবার ছোট ছোট পায়ে টলমল করে ছুটে যাচ্ছিল মা হাতিটার দিকে। বাচ্চাটার চঞ্চলতা লক্ষ করে মা হাতিটা যেন রেগে গিয়েই শুঁড় দিয়ে ওর মাথায় আলতো করে থাপ্পড় মারল। মাতৃস্নেহের সেই শাসনের দৃশ্য বড় মনোরম। যে কোনও বাচ্চাই বড় আদরের হয়, বড় সুন্দর হয়। এই জন্যই হয়তো শিশুদের ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

হাতির পাল ধীরে ধীরে ঝরনাটার দিকে চলে যেতেই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দলের মধ্যে বাচ্চা থাকলে হাতিরা এমনিতেই আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকে। এই সময় আমাকে দেখতে পেলে ওরা ছেড়ে কথা বলতো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঢাল বেয়ে নীচে নেমে পড়লাম। হাতিগুলো তো ঝরনাটার দিকেই গেছে, জানি না শিবুরা কীভাবে এদিকে আসবে।

কিছুক্ষণ ওদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখি রাস্তার ওপাশের জঙ্গল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো ভৈরব। পিছন পিছন শিবু আর শংকরও বেরিয়ে এলো। দেখি সত্যিই একটা বড় বনবরা মেরেছে শিবু। গাছের একটা ডালে বরাটাকে বেঁধে দু'জনে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলো। বিরাট দাঁতাল বরা, দেখে বেশ ভয়ই লাগল। জানি না শুধু তিরধনুক দিয়ে কীভাবে এই বরাটাকে মারতে পারল শিবু। একটুকু ভুল হলেই বরাটা ওকে দাঁত দিয়ে ফেড়ে ফেলতে পারত। একা একা এরকম ঝুঁকি নেওয়াটা ওর ঠিক হয়নি। যাই হোক, একজোট হতেই সবাই মিলে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলাম জঙ্গলবাড়ির দিকে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। হাতির পাল জল খেয়ে এখুনি হয়তো ফিরবে না। কিন্তু খামোখা ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। এমনিতেই কপাল এখন খারাপ চলছে। বেলাও পড়ে আসছে, দুপুরের মধ্যেই জঙ্গলবাড়িতে ফিরতে হবে। সেখানেও একটা শিকার করা এখনও বাকি।

২৫

জঙ্গলবাড়িতে যখন ফিরলাম তখন আমাদের একেবারে গলদঘর্ম অবস্থা। শেকড়বাকড়ের বোঝাটা জিপের উপর রেখে দিলাম। আমার দেখাদেখি শিবু আর শংকরে মিলে বরাটাকেও জিপের পিছনে তুলে দিলো। আমি হেসে ফেলে বললাম, "বাহ, তোদের সঙ্গে থাকলে দেখছি আমাকে একদিন জেলেই যেতে হবে।" ওরা আমার কথা শুনে হাসতে লাগল। তালা খুলে ঘরে ঢুকে জামা-প্যান্ট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আজকেই শুরু হবে আসল কাজ, সমস্ত জঙ্গলবাড়িটা আজ মন্ত্র দিয়ে বন্ধন করে দেবো।

কুয়োতলায় শিবু আর শংকর বালতিতে জল তুলে হাত পা ধুচ্ছিল। ওদের হাত পা ধোয়া হলে আমি আরও একবার স্নান করে নিলাম। এমনিতেই জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটার ক্লান্তিতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। কুয়োর ঠান্ডা জলের স্পর্শে শরীরের সেই ম্যাজমেজে ভাবটা কেটে গেল।

স্নান সেরে ভেজা কাপড়ে আমগাছের তলায় বসে ব্যাগের ভিতর থেকে সমস্ত জিনিসপত্র বার করে সাজিয়ে নিলাম। শিবুকে বলতেই ও দুটো বড় বড় সেগুন পাতা ভেঙে নিয়ে এলো। জল দিয়ে আটা মেখে তাল বানিয়ে সেগুন পাতার উপর নামিয়ে রাখলাম। তারপর মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করে আতপচাল এবং শ্বেতসর্ষপ নিয়ে সেগুলো মন্ত্রপূত করলাম। তারপর সেগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে সিঁদুর আর কুমকুম দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে আবার মন্ত্রপূত করলাম। জঙ্গল থেকে যে সমস্ত শেকড় নিয়ে এসেছিলাম বিশাইয়ের জন্য, সেগুলো নিয়ে ছুরি দিয়ে প্রাদেশ প্রমাণ মাপে কেটে রাখলাম। আবার কী করতে চলেছি সেটা বুঝতে না পেরে শিবু আর শংকর হাঁ করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। ওদের সেই বেকুবের মতো চাউনি লক্ষ করে হেসে ফেললাম। এতদিন তো ওরা আমাকে শুধু গ্যারেজ মেকানিক হিসেবেই চিনত। বুঝতে পারছি, আমার এই নতুন রূপটাকে ওরা

কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। কী জানি, এইসব তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার দেখে হয়তো মনে মনে ওরা আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কথাটা মনে হতেই আবার হাসি পেয়ে গেল। ওদের ভালোবাসাই আমার জন্য যথেষ্ট, ওসব সমীহ-টমীহ আমার পোষাবে না। আমি ওদের বন্ধু, আর সেটাই থাকতে চাই।

শংকরকে বললাম চারটে মজবুত খুঁটি কেটে নিয়ে আসতে। ও চলে যেতে লাল এবং কালো সুতোর গোছাগুলো বার করে শিবুর সাহায্যে সুতোগুলো খুলে গুছিয়ে রাখলাম একপাশে। এইবার আসল কাজ। মেখে রাখা আটার তালটা নিয়ে একটা প্রাদেশ প্রমাণ মাপের পুতুল তৈরি করলাম। এটাই বিশাইয়ের প্রতিকীরূপে কাজে লাগাব। তারপর সেটার সারা গায়ে অঙ্গারচূর্ণ, সিঁদুর এবং কুমকুম মাখিয়ে মন্ত্রদ্বারা পুতুলটির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলাম। ওদিকে শংকর ততক্ষণে চারটে মজবুত শালখুঁটি কেটে নিয়ে এসেছে। শিবুকে বলতেই ও ঘরের মধ্যে থেকে একটা শাবল বার করে নিয়ে এলো। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ওই আটার পুতুল, সুতোর গোছা এবং সমান মাপে কাটা জড়িবুটিগুলো নিয়ে বাড়িটার পিছন দিকে গেলাম।

পিছনে সিমেন্টের দাওয়া পেরিয়ে ওদিকের সেই পায়খানার চেম্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ভৈরব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে শুরু করল। প্রথম দিন থেকেই এই জায়গাটা ওর পছন্দ নয়। আমারও তাই একটু সন্দেহ হয়েছিল। এতবড় চেম্বার তো আর ভেঙে দেখা সম্ভব নয়। ওর মধ্যে নামার মতো সাহসও আমার নেই। শিবুকে বললাম চট করে শাবল দিয়ে চেম্বারটার চারকোণে চারটে গর্ত খুঁড়ে ফেলতে। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারটে গর্ত খোঁড়াও হয়ে গেল। শংকরকে বললাম খুঁটিগুলো ভালো করে ওই গর্তের মধ্যে পুঁতে দিতে। খুঁটিগুলো পোঁতা হলে কালো রঙের সুতোর গোছাটা নিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটিতে বাঁধতে শুরু করলাম। এইভাবে পুরো চেম্বারটাকে বেড় দিয়ে খুঁটিগুলোতে প্রথমে কালো এবং তারপরে লাল সুতো

দিয়ে বেঁধে দিতেই একটা চতুষ্কোণ তৈরি হয়ে গেল। তারপর বন্ধনমন্ত্র পড়তে পড়তে আটার তৈরি পুতুলটা নৈঋত কোণের খুঁটিটার সঙ্গে বেঁধে তার চারিদিকে সেই সমান মাপের ঝড়িবুটি দিয়ে আবার ভালো করে বেঁধে দিলাম। ব্যস, আপাতত আমার কাজ শেষ। এবার ওই মন্ত্রপূত শ্বেতসর্ষপগুলো বাড়ির বাউন্ডারি বরাবর ছড়িয়ে দিলেই বাস্তুবন্ধন সম্পূর্ণ। এসব দেখেশুনে শিবুর মুখটাই সব থেকে বেশি হাঁ হয়েছে বলে ওকেই সেই দায়িত্বটা দিলাম। শংকর এবং ভৈরবও শিবুর সঙ্গেই গেল। আমিও ঘরে গিয়ে ভেজা কাপড় ছেড়ে জামা-প্যান্ট পরে উঠোনে বেরিয়ে এসে দেখি শিবুর সঙ্গে শংকর ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে।

শংকর বলছে ওকেও কিছুটা শ্বেতসর্ষপ ছড়াতে দিতে হবে। কিন্তু শিবু একেবারেই গোঁয়ার, কিছুতেই ও শংকরকে কাজের ভাগ দেবে না। জিপের বনেটের উপর বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওদের ঝগড়া উপভোগ করতে লাগলাম। ওরা ঝগড়া করতে করতেই বাউন্ডারির চারিদিকে ঘুরছিল। এইভাবে সমস্ত বাস্তুটা প্রদক্ষিণ করে শ্বেতসর্ষপ ছড়িয়ে ওরা ফিরে এলো আমার কাছে। শংকরের মুখ গোমড়া, ও অনেক বলাতেও শিবু ওকে শ্বেতসর্ষপগুলো ছড়াতে দেয়নি। ওর গম্ভীরমুখ দেখে আমি হেসে বললাম, "চল, আজ তোদের গ্রামে গিয়ে ফুর্তি করব। শিকার তো করেই ফেলেছিস। শিকারের কষা মাংস আর মহুয়া দিয়ে আজ জমিয়ে আনন্দ করা যাবে।"

আমার কথা শুনে ওদের আনন্দ আর ধরে না। ভীষণ খুশি হয়ে শিবু বলল, "পণ্ডিত, আজ তাহলে আর তোকে ইখেনে ফিরতে দিব নাই। আজকের রাতটা গাঁয়েই থাকতে হবেক তুকে। সারারাত ফুর্তি চলবেক আজ।"

"নিশ্চয়ই, আর আজ আমি তোদের রান্না করে খাওয়াব।" বলেই শংকরের দিকে তাকালাম, "আর তুই কী করবি শংকর?"

"আমি মহুয়া খাঁয়ে নেশার ঘোরে শিবার জন্যে কন্যা খুঁজতে যাব রে।" বলেই হাসতে হাসতে গেটের দিকে ছুট লাগাল শংকর।

"কাঁড় (তির) ভুঁকে দিব রে শংকরা। দাঁড়া তোর মজা

দেখাচ্ছি।" বলেই শিবু ওকে ধরার জন্য ওর পিছন পিছন দৌড়ে গেল। শংকরটা গম্ভীর মুখ করে থাকলেও ভীষণ ফাজিল ছেলে। শিবুর বউ ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে চলে গেছে। তাই ওকে খোঁচা মারার জন্যই শংকর ওর জন্য কনে দেখতে যাবার কথাটা বলল। শিবু ছুটে গিয়ে শংকরকে ধরে ফেলতেই ও মাটিতে বসে পড়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল, "হেই বাপ, ক্ষমা করে দে রে, আর বলব নাই। মাইরি বলছি, আর বলব নাই।"

ওদের কাণ্ড দেখে আমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম। ওহ, কতদিন পর আবার সেই আগের মতো মন খুলে হাসতে পারছি৷ কতদিন পর আবার যেন জীবনটা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে।

যাই হোক, ওদের খুনসুটি শেষ হলে আমরা জঙ্গলবাড়িতে তালাচাবি এঁটে গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আজ আমার অনেক দিনের সাধ পূরণ হলো। প্রতিশোধের যে আগুন বুকের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, তা-ও এখন নিভে গেছে। আমি শোধ নিতে পেরেছি। এইবার বিশাই ছটফট করবে যন্ত্রণায়। আর আমি তারিয়ে তারিয়ে মজা নেব। ওকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাব কিছুদিন। তারপর ওকে মুক্তি দেবো এই অভিশপ্ত জীবন থেকে। ততদিন ও নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করুক। ভৈরব হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই আকাশের দিকে মুখ করে ডেকে উঠল, 'ভৌ ভৌ।'

জিপে স্টার্ট দিয়ে মনের আনন্দে আমরা এগিয়ে চললাম কাঁড়বাঁধি গ্রামের উদ্দেশে। আজ ওখানে শিকারের মাংস দিয়ে ভোজ হবে, মহুয়ার ফোয়ারা ছুটবে। নাচ-গান করে ফুর্তি চলবে সারারাত।

২৬

দেখতে দেখতে পনেরোটা দিন কেটে গেল। বিশাই আর কোনও উৎপাত, আর কোনও সমস্যা তৈরি করতে পারেনি। শুধু সন্ধ্যের পর জঙ্গলবাড়ির আশেপাশে গেলে শোনা যেত কোনও

মহিলার বীভৎস বিলাপ আর হাহাকার। সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়ে সকালে সূর্যোদয় অবধি সেই অসহ্য হাহাকারের শব্দে সমস্ত জঙ্গল পাহাড় যেন গুমরে গুমরে উঠত। বড় অসহ্য, বড় মর্মান্তিক সেই কান্না। কেউ যদি হঠাৎ রাতের অন্ধকারে সেই কান্না শোনে তাহলে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সন্ধ্যার পর জঙ্গলবাড়ির পিছন দিক থেকে সেই কান্নার শব্দটা ভেসে এসে যেন জোর করে কানের মধ্যে ঢুকে অন্তরাত্মাকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। প্রথম কয়েক দিন আমি তাই ওধার মাড়াইনি, শিবুদের সঙ্গেই থেকে গিয়েছিলাম কাঁড়বাঁধি গ্রামে।

ওদের সঙ্গে ক'দিন খুব মজায় কাটালাম। আবার পুরোনো দিনের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, বনের ফল-পাকুড় খাওয়া, টুকটাক শিকার— এসবই চলছিল। জিপটা স্বরূপকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। আর ওটা আটকে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই, বাইকই ভালো। বাইক নিয়েই ঘুরে বেড়াই এদিক ওদিক, কখনও শিবুকে নিয়ে আবার কখনও শংকরকে নিয়ে। কখনও আবার তিনজনেই বাইক নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরতে ঘুরতে ঝালদা পেরিয়ে তুলিন হয়ে রাঁচির দিকে চলে যাই। কখনও আবার বরাবাজার ছাড়িয়ে দলমা পাহাড়ের ওদিকে টাটা জামশেদপুরের দিকে পাড়ি জমাই। এভাবে দশ-বারোদিন কাটানোর পর ধীরে ধীরে আনন্দটা কেটে গিয়ে আবার বিরক্তিবোধ শুরু হলো। কাজকর্ম কিছু নেই, শুধু খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো। এভাবে কতদিন আর ভালো লাগে!

আবার পুরোনো দুঃখগুলো ফিরে এলো মনের মধ্যে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠে আবার ফিরলাম জঙ্গলবাড়িতে। নাহ, এখানে আর থাকা যাবে না, আমি ভুল ভেবেছিলাম। এইভাবে সময় নষ্ট করে আমি হয়তো নিজেকেই ফাঁকি দিতে চাইছি। এই জঙ্গলবাড়িতে কিছুদিনের জন্য এসে ছুটি কাটানোই যায়, কিন্তু পাকাপাকি ভাবে থেকে যাওয়া সম্ভব না। গুরুদেবের নির্দেশে আমাকে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। ফের যদি বাড়িছাড়া হয়ে যাই তাহলে তাঁর কথার অমর্যাদা করা হবে। হয়তো নিয়তিই আমাকে

এখানে টেনে এনেছিল; বিশাইয়ের হাত থেকে গ্রামের মানুষদের বাঁচাতে। হয়তো ঈশ্বর চেয়েছিলেন আমি নিজের হাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, তাই আবার আমাকে এই জঙ্গলবাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। জঙ্গলের এই পরিবেশ, এই সৌন্দর্য আমাকে আরও বেশি করে বাড়ির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। এই স্বপ্নের দুনিয়াতে কিছুদিন সময় কাটানো যেতেই পারে কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে তো বসবাস সম্ভব নয়। একদিন তো জেগে উঠতেই হবে। জোৎস্না রাতে যখন সমস্ত জঙ্গল রুপোর ঝরনায় স্নান করে সেজে ওঠে তখন বাড়ির জন্য ভীষণ মন খারাপ করে। এই সৌন্দর্যের একা মালিকানা পেয়ে কী লাভ!

রাত্রিবেলায় একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, কী যে খুঁজি নিজেও জানি না, তবু খুঁজতে থাকি। হয়তো নিজেকে খুঁজি। হয়তো পাঁচবছর আগের সেই বিক্রমকে খুঁজি যে জীবনের কঠিন পরিস্থিতির ভয়ে পালিয়ে যেত না। যে সংঘর্ষ করে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে করে নিতে সক্ষম ছিল। হয়তো রাজাকে খুঁজি, খুব জানতে ইচ্ছে করে ও আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছে কিনা। কতদিন হয়ে গেল মোবাইলটা বন্ধ করে রেখেছি, বাড়ির সঙ্গেও আর কোনও যোগাযোগ নেই। আর যেন কিছুই ভালো লাগতে চায় না।

প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কই, আর সেরকম আনন্দ হচ্ছে না কেন? আমার চিকিৎসায় লখিরাম হাঁসদার বউ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। সমস্ত কাঁড়বাঁধি গ্রামের মানুষের কাছে আমার মানমর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু সাফল্যের সেই আনন্দ কই? সব কিছু ছেড়ে আবার একা একা জঙ্গলবাড়িতে দিন কাটাতে শুরু করেছি, নির্জনে নিস্তব্ধতায়। বিশাইয়ের সেই হাহাকার করে কান্না আর আমাকে শান্তিতে ঘুমোতে দেয় না। রাতের পর রাত জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু মন খারাপ আমার পিছু ছাড়ে না। এইভাবে চলতে থাকলে আমি একদিন পাগল হয়ে যাব। আমাকে পালাতে হবে, এই স্বপ্নের দুনিয়া ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে। আজ বুঝতে পারছি যে শুধুমাত্র সুখভোগ করে ভালো থাকা যায়

না। জীবনে যদি দুঃখ না থাকে, যদি যন্ত্রণা না থাকে তাহলে পাগল হয়ে যেতে হয়।

ছন্নছাড়া হয়ে কিছুদিন কাটানোর পর ঠিক করলাম এইবার চরম সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছে। এইবার সব হিসেব শেষ করে দিয়ে চলে যেতে হবে। আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে, এইবার বন্ধনমুক্ত হওয়ার পালা। ভৈরবকে এড়িয়ে চলতে চাইছিলাম। কেন জানি না ও বড় বেশি জড়িয়ে পড়ছে আমার সঙ্গে। একমুহূর্তও আমাকে ছেড়ে থাকে না। কতবার ওকে শিবুদের গ্রামে রেখে এলাম, কিন্তু জঙ্গলবাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই দেখি লেজ নেড়ে নেড়ে পিছন পিছন চলে এসেছে। কেন জানি না ও সব সময় আমাকে আগলে রাখতে চায়। আচ্ছা, আমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছি! আমি কি স্বার্থপর? শুধুমাত্র নিজের সুখের কথা ভেবে ঘর পরিবার ছেড়ে এই জঙ্গলে পড়ে আছি বলেই কি আমার মনের শান্তিটা হারিয়ে গেছে? কী জানি!

প্রতিদিন ভাবি, আর না, এইবার সব শেষ করে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। কিন্তু কী এক অলৌকিক আকর্ষণে আমাকে আটকে ফেলেছে জঙ্গলবাড়িটা। ভেবেছিলাম বিশাইটাকে তার পাপের শাস্তি দিতে ওভাবেই বন্দি করে রেখে দেবো চিরকালের জন্য। ওই অন্ধকূপে ও চিরকাল ধরে হাহাকার করে কাঁদুক। যে নিদারুণ যন্ত্রণায় আমি এতগুলো দিন কাটিয়েছি, ও সেই যন্ত্রণাগুলো উপলব্ধি করুক। কিন্তু কিছুতেই যেন মনের সেই দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারছি না। বিশাইয়ের ওই কান্না যেন আমার মনের কাঠিন্যকে ধীরে ধীরে নমনীয় করে তুলছিল।

একদিন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম, আর বিশাইকে বন্দি করে না রেখে ওকে মুক্তি দেবো। সেইমতো সকালেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে ঝালদা থেকে হোম যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ কিনে নিয়ে এলাম। শিবু বা শংকরকে কিছু জানালাম না, শুধু বিকেলে ফেরার পথে ওদের গ্রাম থেকে একটা দেশি মোরগ কিনে নিয়ে এলাম। আমি নিজেও জানি না যে ঠিক কী করতে চলেছি। একটা

অদ্ভুত জেদ কাজ করছিল মনের মধ্যে, এর শেষ দেখতে হবে। ভৈরব সারাদিন জঙ্গলবাড়িতে একা একাই ছিল। আমি ফেরার পর লেজ নেড়ে নেড়ে আমার চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। কী জানি ও কী সন্দেহ করছে! ওর এই অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়াটাও আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। চেনা নেই জানা নেই দু'দিনের পরিচয়, ও আমার উপর এত খবরদারি করবে কেন? ভৈরবকে গ্রাহ্য না করে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলাম। তারপর ভেজা কাপড়ে বাড়ির পিছনে গিয়ে চেম্বারের চারকোণে খুঁটিগুলোতে বাঁধা সুতো টান মেরে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ঝোপের মধ্যে।

আজ রাতে বিশাইকে জাগিয়ে ওকে মুক্ত করে দেবো। আজ দেখব বিশাইসিদ্ধ হয়ে কেমন লাগে!

বিশাই কোনও ভূতপ্রেত বা অপদেবতা নয়, বিশাই হলো শক্তি। পথভ্রষ্ট তান্ত্রিক তার বিকৃত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সাধনার দ্বারা বিশাইকে জাগ্রত করে বিশাইসিদ্ধ হয়। শক্তির নিজস্ব কোনও চরিত্র থাকে না, তাকে যেরকম চরিত্র দেওয়া হয় সে সেই চরিত্রেই অভিনয় করতে থাকে। যেমন একটি দেশলাইয়ের মধ্যে যে দাহিকাশক্তি থাকে তাকে কাজে লাগিয়ে রান্নার জন্য উনুন ধরানো যায়। আবার দুষ্টলোকে সেই দাহিকাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্যের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিশাইয়ের শক্তির ক্ষেত্রেও তাই। শক্তির মালিক তাকে কীভাবে ব্যবহার করবে তার উপরে নির্ভর করে শক্তির চরিত্র।

বিশাইসিদ্ধ হওয়া খারাপ কিছু নয়, কিন্তু বিশাইয়ের শক্তিকে অপব্যবহার করলেই তা সাধকের জন্য ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ছিলেন মাহাত বা তাঁর গুরু সেই সাঁওতাল গুণিন এই শক্তির অপব্যবহার করেই মরেছিল। এবং তাদের সেই প্রতিহিংসা পরায়ণ বিকৃত মানসিকতা বিশাইয়ের মধ্যে থেকে গেছে। অপঘাতে মরার ফলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি পায়নি। তারা মুক্তির জন্য দিনরাত ছটফট করেছে। তাদের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা বিশাইকে আরও আরও শক্তিশালী করে তুলেছে দিনের পর দিন। পাক্কাকুহালি

অদ্ভুত জেদ কাজ করছিল মনের মধ্যে, এর শেষ দেখতে হবে। ভৈরব সারাদিন জঙ্গলবাড়িতে একা একাই ছিল। আমি ফেরার পর লেজ নেড়ে নেড়ে আমার চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। কী জানি ও কী সন্দেহ করছে! ওর এই অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়াটাও আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। চেনা নেই জানা নেই দু'দিনের পরিচয়, ও আমার উপর এত খবরদারি করবে কেন? ভৈরবকে গ্রাহ্য না করে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলাম। তারপর ভেজা কাপড়ে বাড়ির পিছনে গিয়ে চেম্বারের চারকোণে খুঁটিগুলোতে বাঁধা সুতো টান মেরে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ঝোপের মধ্যে।

আজ রাতে বিশাইকে জাগিয়ে ওকে মুক্ত করে দেবো। আজ দেখব বিশাইসিদ্ধ হয়ে কেমন লাগে!

বিশাই কোনও ভূতপ্রেত বা অপদেবতা নয়, বিশাই হলো শক্তি। পথভ্রষ্ট তান্ত্রিক তার বিকৃত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সাধনার দ্বারা বিশাইকে জাগ্রত করে বিশাইসিদ্ধ হয়। শক্তির নিজস্ব কোনও চরিত্র থাকে না, তাকে যেরকম চরিত্র দেওয়া হয় সে সেই চরিত্রেই অভিনয় করতে থাকে। যেমন একটি দেশলাইয়ের মধ্যে যে দাহিকাশক্তি থাকে তাকে কাজে লাগিয়ে রান্নার জন্য উনুন ধরানো যায়। আবার দুষ্টলোকে সেই দাহিকাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্যের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিশাইয়ের শক্তির ক্ষেত্রেও তাই। শক্তির মালিক তাকে কীভাবে ব্যবহার করবে তার উপরে নির্ভর করে শক্তির চরিত্র।

বিশাইসিদ্ধ হওয়া খারাপ কিছু নয়, কিন্তু বিশাইয়ের শক্তিকে অপব্যবহার করলেই তা সাধকের জন্য ভয়ংকর হয়ে ওঠে। দ্বিজেন মাহাত বা তাঁর গুরু সেই সাঁওতাল গুনিন এই শক্তির অপব্যবহার করেই মরেছিল। এবং তাদের সেই প্রতিহিংসা পরায়ণ বিকৃত মানসিকতা বিশাইয়ের মধ্যে থেকে গেছে। অপঘাতে মরার ফলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি পায়নি। তারা মুক্তির জন্য দিনরাত ছটফট করেছে। তাদের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা বিশাইকে আরও আরও শক্তিশালী করে তুলেছে দিনের পর দিন। পাতাকুড়ানি মহিলা এবং বুধনাকে মারার পর তাদের আত্মারও দখল নিয়েছিল

বিশাই। শক্তি বাড়ানোর জন্য তাদের দেহধারণ করে নিজের রক্তপিপাসা মিটিয়ে চলেছিল। এক এক করে এদিকের জঙ্গলের মধ্যে চলে আসা নানা পশুপাখিকে খেয়েছে ওই বিশাই। তাই তারা এদিকের জঙ্গল ছেড়ে গোর্গাবুরুর ওদিকে চলে গিয়েছিল। জঙ্গলটাকে শ্মশানে পরিণত করে ছেড়েছিল ওই ভয়ংকর বিশাই। গোর্গাবুরুর ওদিকে যাওয়ার সাহস ওর ছিল না, কারণ ওদিকটা জঙ্গল পাহাড়ের দেবতা গোর্গাবুরুর নিজের এলাকা। সেজন্যই ও গ্রামে গিয়ে গৃহপালিত পশুদের ধরে এনে খেতে শুরু করেছিল।

একা একা জঙ্গলে ঘুরে আমি বিশাইয়ের অত্যাচারের অনেক প্রমাণ পেয়েছি। বাড়ির পিছন দিকে বাউন্ডারির বাইরে ঝোপের ভিতরে দেখেছি বিশাইয়ের হাতে মৃত পশুপাখিদের হাড় আর পালকের স্তূপ। জঙ্গলে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ানোর সময় এই ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। হাড়মা মান্ডি অনেক আগে গল্পচ্ছলে আমাকে এই জঙ্গল পাহাড়ের দেবদেবীদের কথা বলেছিল। বলেছিল, জঙ্গলের মধ্যে সেই প্রাচীন বস্তির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ। শুনেছিলাম, কোন অভিশাপে তাদের গোর্গাবুরুর রাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। গোর্গাবুরু এবং তার আশেপাশের এলাকায় পা রাখার সাহস কোনও ভূতপ্রেত বা অপদেবতার নেই। তাই বিশাইটা ওদিকে না গিয়ে গ্রামে থেকে শিকার ধরতে শুরু করেছিল। ওই ইতিহাস জেনেছিলাম বলেই দুইয়ে দুইয়ে মিলিয়ে চার করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সব জানার পরও যে সমস্যাটা সামনে ছিল তা হলো বিশাইয়ের মুক্তি।

বিশাই কোনও আত্মা নয় যে তার মুক্তি হবে। বিশাই একটি শক্তি, আর শক্তিকে ধ্বংস করা যায় না। তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে পারি, কিন্তু সেটাও কোনও চিরস্থায়ী সমাধান নয়। আমাদের মতো কেউ আবার কোনও দিন ভুল করে জাগিয়ে তুলবে বিশাইকে এবং আবার ধ্বংসলীলা শুরু হবে। তাই অন্য উপায় খুঁজে বার করতে হবে। সব থেকে ভালো উপায় হলো, বিশাইয়ের সাধনা করে তাকে টোপ দিয়ে জাগিয়ে এনে দেহমুক্ত করতে হবে। তারপর মারণমন্ত্র প্রয়োগ করে বিশাইয়ের শক্তিকে

কোনও জীবিত প্রাণীর মধ্যে আকর্ষণ করে সেই প্রাণীকে হত্যা করলেই হওয়া যাবে বিশাইসিদ্ধ। আমি এই মন্ত্রের প্রয়োগ এর আগে কখনও করিনি, গুরুদেব কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এখন এছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও তো নেই। এই ঝুঁকি আমাকেই নিতে হবে। এরকম অস্থায়ী ভাবে বিশাইকে যে বেশিদিন বন্দি করে রাখা যাবে না তা আমি ভালোই জানি। ওকে মুক্ত করতেই হবে।

কিন্তু আমিও কি পারব বিশাইসিদ্ধ হয়ে নিজে সংযমী থাকতে? কখনও কোনও দিন ভুল করেও যদি ওই ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফেলি? কোনও দিন যদি আমার মধ্যে ক্ষমতার লোভ চলে আসে? কোনও দিন যদি রাগের বশবর্তী হয়ে বিশাইয়ের শক্তি দিয়ে কারও ক্ষতি করে ফেলি! আমি অনেক ভেবেও নিজের কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আর কাকেই বা বলব! আর তো কেউ এই ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না।

অন্তত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও মানুষ তো হবেই না। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, এই ঝুঁকি আমি নেব। মরতেই তো চেয়েছিলাম আমি, এখন নাহয় কয়েক বছর পরই মরব। কিন্তু বিশাইকে আর ওরকম বিপজ্জনকভাবে বন্দি করে রাখব না। আমাকে এই জঙ্গল ছেড়ে এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমিও আর বন্দি হয়ে থাকতে চাই না।

২৭

বিকেল থেকেই আকাশের মুখ ভার। থেকে থেকে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হয়তো রাত্রের দিকে বৃষ্টি হতে পারে। তন্ত্রসাধনার জন্য একদম উপযুক্ত পরিবেশ।

সন্ধ্যের পর সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করে আমগাছের নীচে সেই বড় পাথরটার উপরে যজ্ঞের কুণ্ড প্রস্তুত করলাম। ভৈরব হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমি কী করতে চলেছি। চিৎকার করে ও আমাকে বাধা দিতে চাইছিল। বারবার ওকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে

দিচ্ছিলাম। কেন জানি না, সব কিছুর উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে আমার। নিজের চারিদিকে শ্বেতসর্ষপের দানা ছড়িয়ে বন্ধন করে নিয়ে বসে পড়লাম যজ্ঞে। দেখি ভৈরবও গুটিগুটি এসে সেই গণ্ডির ভিতর বসে পড়ল।

যজ্ঞ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই ভয়ানক এক গর্জন ভেসে এলো বাড়িটার পিছন দিক থেকে। বিশাইয়ের ঘুম ভেঙেছে তাহলে! আজ পনেরো ষোল দিন পর ও মুক্ত হয়েছে, ওকে আটকাতে না পারলে ভীষণ সর্বনাশ হয়ে যাবে। অবশ্য এই বাড়িটা বন্ধন করা আছে। ও এই বাড়ির বাউন্ডারির বাইরে বেরোতে পারবে না। আমার ভয় হচ্ছে ভৈরবকে নিয়ে। যদি কোনও ভাবে ও গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে বেঘোরে মারা পড়বে। কিন্তু দেখলাম ভৈরব বিশাইয়ের গর্জন শুনতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ডাকাডাকি করছে বটে, কিন্তু গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে গেল না। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার মারণযজ্ঞে মনোযোগ দিলাম। বড় কঠিন এই যজ্ঞ! গুরুদেব বলতেন যেন কখনও ভুলেও এই মারণযজ্ঞের প্রয়োগ না করি। শক্তির নেশা বড় খারাপ, ভালো মানুষকেও শয়তান বানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আজ আমি নিরুপায়।

অন্ধকূপের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে বিশাই ভয়ানক গর্জন করে উঠে আসছিল। এখন সামনে যাকেই পাবে তাকেই মেরে নিজের রক্তপিপাসা মিটিয়ে নিতে চাইবে। যজ্ঞ করতে করতে দেখতে পেলাম সেই শীর্ণকায়া মহিলাটি বাড়ির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে আসছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, বড় বড় চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে ওর মুখটাকে ঢেকে দিচ্ছে বারবার। মুখ দিয়ে একটানা 'আঁ আঁ' আওয়াজ করে পা টেনে টেনে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। উফফ! সেই হাড়হিম করে দেওয়া গর্জন আমি কখনওই ভুলতে পারব না। ওর সেই গর্জন শুনে আমার সারা শরীরে আতঙ্কের একটা শিহরণ বয়ে গেল। অবশ্য ও এই গণ্ডির ভিতরে ঢুকে আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। ভৈরব ওকে দেখতে পেয়ে ভীষণ রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। কিন্তু দেখলাম ওর হুঙ্কারে সেই আগের মতো জোর আর নেই। বুঝলাম, আমার মতোই

ভৈরবও ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

যাই হোক, আমি আবার যজ্ঞে মন দিলাম। এখন আর ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যা শুরু করেছি তা আমাকেই শেষ করতে হবে। মারণমন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিতেই বিশাইটা যেন আগুনের ঝাঁকা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আবার সেই হাড়হিম করা গর্জন করে তেড়ে এলো আমাদের দিকে। কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে রাখা শ্বেতসর্ষপের উপর পা দিতেই যেন তড়িদাহত হয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে আবার চিৎকার করে আমাদের চারপাশে গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল বিশাইটা। যেন কোথাও কোনও ফাঁক পেলেই গণ্ডির ভিতরে ঢুকে পড়ে আমাদের ছিড়ে খেয়ে ফেলবে। যজ্ঞের আগুনের আভায় ওর চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলে উঠছিল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রচণ্ড লালসায় ওর মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ছে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত 'অ্যাঁ- অ্যাঁ- অ্যাঁ' শব্দ করে পা টেনে টেনে আমাদের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। তারপর হিংস্র লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে শুরু করল। এই বাড়ির বাইরে ও যেতে পারবে না এখন।

একটু পরে বাড়িটাকে বন্ধন মুক্ত করে ওকে নিয়ে যাব শমের বাগানের দিকে। আমি চাই না ওর পচাগলা লাশটা আমার জঙ্গলবাড়ি থেকে উদ্ধার হোক। মোরগটা পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল মাটিতে। মাঝে মাঝে ঝটপট করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু পা বাঁধা থাকায় পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে। আর কিছুক্ষণ পরে ওকে বলি দিতে হবে, নাহলে বিশাইকে দেহমুক্ত করে ওর শক্তিকে নিজের বশীভূত করতে পারব না। ঘটি থেকে জল নিয়ে মন্ত্রপূত করে ছিটিয়ে দিলাম মোরোগটার গায়ে। ভৈরব আমার পিছনে বসে বিশাইয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটানা গর্জন করে যাচ্ছিল। ওকে নিয়ে এই এক সমস্যা!

তাড়াতাড়ি যজ্ঞকুণ্ড থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম বিশাইটার দিকে। আর্তনাদ করে ছিটকে কিছুটা দূরে সরে গেল। তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলো নিজের

জায়গায়। আমি আবার যজ্ঞে আহুতি দেওয়া শুরু করলাম। সমস্ত আহুতি দেওয়া শেষ হলে উপযুক্ত সমিধ আর জড়িবুটি দিয়ে যজ্ঞ শেষে পূর্ণাহুতি দিলাম। খাঁটি গব্যঘৃতের আহুতি পেয়ে শুকনো শালকাঠগুলো দাউদাউ করে ভীষণ উচ্ছ্বাসে জ্বলে উঠল। রাতের অন্ধকারে সেই লেলিহান আগুনের শিখা জঙ্গলের এই নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশকে আরও ভয়াবহ করে তুলছিল। ভয় আমিও পাচ্ছিলাম, কারণ সামান্য ভুলের জন্য আমার নিজেরই প্রাণসংশয় হতে পারে। আর যদি নির্ভুলভাবে সমস্ত কিছু করতে পারি তাহলে বিশাইয়ের শক্তি আমার করায়ত্ত হবে, আমি হয়ে উঠব বিশাইসিদ্ধ।

পূর্ণাহুতির পর আমি মারণমন্ত্রের জপ শুরু করলাম। মোরগটাকে দু'হাতে তুলে ধরে জপ করতে করতে আড়চোখে দেখে নিলাম বিশাইটার দিকে। এতক্ষণ ও মাটিতে বসে গর্জন করছিল, কিন্তু মন্ত্র জপ শুরু করতেই যেন ভয়ানক খেপে গেল বিশাইটা। 'আঁ- আঁ- আঁ' শব্দে বীভৎস চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, তারপর ছুটতে শুরু করল গেটের দিকে। ও হয়তো বুঝতে পারছিল আমি কী করতে চলেছি, তাই জঙ্গলে পালিয়ে যেতে চাইছিল। দেখলাম ছুটতে ছুটতে গেটটার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল বিশাইটা। বাস্তুর বন্ধন কেটে বেরোতে না পেরে বিকট চিৎকার করতে করতে বাউন্ডারির চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। আমি জপ সম্পূর্ণ করে মন্ত্রপূত জল নিয়ে আবার ছিটিয়ে দিলাম মোরগটার উপর। এখন ওই বিশাইয়ের প্রাণভোমরা এই মোরগের মধ্যে। যে এই মোরগটাকে মারবে বিশাইয়ের শক্তি তার মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে যাবে, সে-ই হবে বিশাইসিদ্ধ। জপ শেষ হতেই দেখলাম চিৎকার বন্ধ করে কুয়োতলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশাইটা। তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে বসে এমন ভাবে তাকাতে শুরু করল যে ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল।

এইবার বাড়িটা বন্ধনমুক্ত করে বিশাইকে লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে পাথর খাদানের ওদিকে। মোরগটাকে পাশে নামিয়ে রেখে বাস্তুবন্ধন কাটানোর মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম।

বিশাই আর পালাবে না, ওই মোরগের মধ্যে ওর প্রাণভোমরা ভরা আছে। এখন এই মোরগটার কাছ থেকে ও কোথাও নড়বে না। এটা দেখিয়েই ওকে বশ করে টেনে নিয়ে যাব পাথর খাদানে। তারপর ওর জারিজুরি সব শেষ করে দেবো।

মন্ত্রপাঠ শেষ হলো এক সময়। এইবার হবে সেই কঠিন পরীক্ষা। একহাতে মোরগ আরেক হাতে ছুরি নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম সেই গণ্ডির ভিতর থেকে। গণ্ডির বাইরে বেরোতেই ভয়ে উত্তেজনায় আমার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল। এই বুঝি বিশাইটা তেড়ে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাঘ যেরকম শিকার ধরার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে, বিশাইটা সেই ভঙ্গিতেই বসেছিল মাটিতে। বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে কেউ, ভয়ে ভয়ে কোনও রকমে এগিয়ে গেলাম গেটটার দিকে। ভৈরবও আমার সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। আমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে শুরু করল। কী জানি, হয়তো ও আমাকে নিষেধ করতে চাইছে। হয়তো ও চাইছে আমি এই আগুন নিয়ে খেলাটা বন্ধ করি। কিছুটা হেঁটে গিয়ে ফিরে তাকালাম পিছনের দিকে। দেখলাম বিশাইটা সেই রকম পা টেনে টেনে এগিয়ে আসছে। গেটের এদিকটায় ঘোর অন্ধকার, উঠোনের আলোটা এদিক পর্যন্ত আসছে না। অবশ্য বাইরে আরও ঘন অন্ধকার জমে উঠেছে। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেই আমাকে হেঁটে যেতে হবে ওই পাথর খাদান পর্যন্ত। গলায় সাধুবাবার দেওয়া রুদ্রাক্ষের মালাটা আছে। এটা থাকতে বিশাই আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। কিন্তু তবুও ভীষণ ভয়ে আমার ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। বিশাইটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ভৈরব আবার ভয়ানক চিৎকার শুরু করে দিলো। আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলাম। গেটটা পেরিয়ে রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নাহ, এবার আর বিশাইটা দাঁড়িয়ে পড়ল না। বাস্তুর বন্ধন কেটে যাওয়ায় সেভাবেই 'আঁ আঁ' করে বীভৎস আওয়াজ করতে করতে গেটটা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। ওকে আসতে দেখে আবার হাঁটতে শুরু

করলাম, এবার সোজা পাথর খাদানের দিকে যাব।

২৮

ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তার মধ্যেই আন্দাজে পা ফেলতে হচ্ছিল। কয়েক বার পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিলাম। ভৈরব কেন জানি না খুব বাধা দিতে চাইছিল আমাকে। আমার চারপাশে ঘুরে আমাকে থামিয়ে দিতে চাইছিল। আমি ওকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চললাম। আর কিছুটা গেলেই জঙ্গল শেষ হয়ে সেই ফাঁকা মাঠটা পাওয়া যাবে। মাঠের শেষে ঢালের নীচেই পাথর খাদান। ওখানে গিয়েই মোরগটার মুণ্ডু কেটে বিশাইকে দেহমুক্ত করে দেবো। তাহলেই আমি হয়ে যাব বিশাইসিদ্ধ। একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল মনের মধ্যে, হয়তো এটাকেই বলে পৈশাচিক আনন্দ। আমি জেনেশুনে ওই ভয়ংকর বিশাইসিদ্ধি লাভ করতে চলেছি।

মাঠটার মধ্যে পৌঁছে চারিদিক স্পষ্ট দেখতে পেলাম মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসায়। ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখলাম, সমস্ত পাহাড় জঙ্গল যেন ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় থমথমে হয়ে আছে। পিছনে ওই ভয়ংকর বিশাই হেঁটে আসছে। আমি জানি ও শুধু একটা সুযোগ খুঁজছে। কোনও ভাবে এই মোরগটাকে একবার ছিনিয়ে নিতে পারলেই ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। ওকে সেই সুযোগ দিলে আমি আর কোনও দিন ওকে নিজের বশে আনতে পারব না। আমি অত বড় তান্ত্রিক নই।

মাঠের মাঝে পৌঁছতেই ভৈরব যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে হুঙ্কার দিয়ে যেন বলতে চাইল, কিছুতেই আমাকে আর এগিয়ে যেতে দেবে না। ওদিকে বিশাইটাও কাছাকাছি এসে পড়েছে। ও আমার নাগাল পেলেই মোরগটাকে কেড়ে নিতে চাইবে। আমি ভৈরবকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে গেলাম। কিন্তু তখনই একঝটকায় আমার হাত থেকে মোরগটাকে কামড়ে ধরে ভৈরব ছুটতে শুরু করল। সর্বনাশ! ও যে আমার

মাঠের ওদিকে খাদানের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে। মোরগটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে পাথর খাদানের দিকে। মোরগটা ছাড়া পাবার জন্য ডানা ঝাপটে তারস্বরে 'ক্যাঁ ক্যাঁ' করে ডাকতে শুরু করল।

এমন সময় চোখে পড়ল বিশাইটাও ভৈরবের পিছন পিছন পাথর খাদানের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। হতচকিত ভাবটা কেটে যেতেই আমিও ছুটতে শুরু করলাম। মোরগটা কোনও রকমে যদি ওই বিশাইয়ের হাতে পড়ে যায় তাহলে যে ভীষণ সর্বনাশ হয়ে যাবে! এবং তার জন্য দায়ী হব আমি। আমার অপরিণামদর্শিতার জন্য বিশাইয়ের উত্থান হয়েছিল, মরতে হয়েছিল আমার প্রিয় বন্ধু রাজাকে। মরতে হয়েছিল এই সমস্ত কিছুর নেপথ্যে থাকা দ্বিজেন মাহাতকে। আবার সেই ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে যাবে। না না, সেটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। যেভাবেই হোক ভৈরবকে আটকাতেই হবে। ভাঙা পা নিয়ে পাথুরে রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে ছোটা একেবারেই অসম্ভব। তবু প্রাণপণ চেষ্টায় ঢাল বেয়ে ছুটতে শুরু করলাম। ভৈরব এবং বিশাই তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে আমার থেকে। পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকলাম, "ভৈরব— দাঁড়া দাঁড়া, ফিরে আয়।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভৈরব ছুটতে ছুটতে পাথর খাদানের আগে সেই বাজপড়া মহুয়া গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ থেকে মোরগটাকে মাটিতে ফেলে সামনের দু'পায়ে চেপে ধরে আকাশের দিকে মুখ তুলে গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল 'ভৌউউ-উউউ।' তারপর মোরগটার মুণ্ডুটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে একটানে ছিঁড়ে ফেলল। ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে চারিদিক আলো করে দিলো। দেখলাম, বিশাইটা ছুটতে ছুটতেই বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে দেখি সেই মহিলার উলঙ্গ শরীরটা মাটিতে পড়ে আছে। দেখতে দেখতে ভীষণ দুর্গন্ধে ভরে উঠল জায়গাটা।

ধপ করে মাটিতে বসে পড়লাম, সব শেষ হয়ে গেল।

বিশাই দেহমুক্ত হয়ে গেছে, তার মানে ভৈরব বিশাইসিদ্ধ হয়ে গেল। বিশাইয়ের শক্তি সঞ্চারিত হলো ভৈরবের শরীরে। এমন সময় গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠতেই ভৈরবের সেই গম্ভীর ডাকটা আবার শুনতে পেলাম। চমকে তাকালাম, কিন্তু কোথায় ভৈরব!

চারপাশে তাকিয়ে কোথাও ভৈরবকে দেখতে পেলাম না। যেন অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওর ডাক ভেসে আসছে। চিৎকার করে ডাকলাম, "ভৈরব, ভৈরব– কোথায় তুই?"

কিন্তু আর কোনও সাড়া পেলাম না। ভৈরব যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ওই খাঁখাঁ প্রান্তরের মধ্যে। এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হতেই ভীষণ দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল, এরকমই এক বৃষ্টির রাতে বিশাই আমার বন্ধু রাজাকে টেনে নিয়ে এসেছিল এখানে। কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলাম।

নাহ, এখানে আর বসে থেকে কোনও লাভ নেই। বৃষ্টিটাও চেপে নামিয়েছে। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করলাম জঙ্গলবাড়ির দিকে। আরে, ওই তো আবার ভৈরবের ডাক শোনা যাচ্ছে! ও যেন জঙ্গলের মধ্যে ডাক দিয়ে আমাকেই খুঁজছে।

জঙ্গলবাড়ির কাছে পৌঁছে কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভৈরবের ডাকও আর শোনা যাচ্ছে না। বুঝতে পারছিলাম, ও নিজের কাজ সেরে ফিরে চলে গেছে।

আর রাগ হচ্ছিল না ওর উপর, ও হয়তো ঠিকই করেছে। আমি বিশাইসিদ্ধ হলে হয়তো কোনও দিন রাগ বা লোভের বশবর্তী হয়ে বিশাইয়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনও অন্যায় করে ফেলতাম। আমিও তো মানুষ, ক্ষমতার নেশায় হয়তো কোনও দিন আবার বিশাইয়ের রক্তপিপাসাকে জাগিয়ে তুলতাম। আবার শুরু হতো বিশাইয়ের আতঙ্ক। তার থেকে এই বেশ ভালো হলো। প্রকৃতির শক্তি ফিরে গেল প্রকৃতির কাছেই। ভৈরব মানুষ নয়, ওর মধ্যে রিপু দোষ নেই। তাই ওর কাছেই এই শক্তি রব

থেকে বেশি সুরক্ষিত থাকবে। আমি হয়তো এখনও অতটা যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি।

মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করে ক্ষমা চাইলাম। আমিও ক্ষমতার লালসায় পড়ে গিয়েছিলাম গুরুদেব। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে মহান শক্তির সঙ্গে আসে বিরাট দায়িত্ব। শক্তিমান হওয়াই বড় কথা নয়, সেই শক্তিকে দায়িত্ব সহকারে ধারণ করাটাই আসল কাজ। আমি হয়তো সেই দায়িত্ব পালন করতে পারতাম না। আমাকে ক্ষমা করুন গুরুদেব। এমন সময় দূরে জঙ্গলের ভিতর থেকে আবার ভৈরবের গম্ভীর গলার ডাক ভেসে এলো। হাতজোড় করে দূর থেকেই ওর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। "হে ভৈরব, তুমি কে আমি জানি না। তোমার স্বরূপ আমি জানতেও চাই না। এটুকু জানি যে তুমি আমাকে আজ আবার রক্ষা করেছ। ক্ষমতার লোভে যে ভয়ংকর পথে আমি পা বাড়াচ্ছিলাম তুমি সেই রাস্তা থেকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছ। তোমায় প্রণাম।"

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আবার ফিরে চললাম জঙ্গলবাড়িতে। আর কোনও ভয় নেই, বিশাইয়ের আতঙ্ক আজ চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল। এবার আমিও বাড়ি ফিরে যাব, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার পরিবারের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নাহলে গুরুদেবের চোখে ছোট হয়ে যাব যে। আমি জানি, তিনি সব সময় আমার উপর নজর রেখেছেন, আমার অনিষ্ট তিনি হতে দেবেন না। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে কেন জানি না খুব কান্না পাচ্ছিল। জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, কিন্তু আজ যা পেলাম তার থেকে মূল্যবান আর কিছু নেই। চিৎকার করে বললাম, "আমি আবার আসব রে ভৈরব। বারবার ফিরে আসব তোর কাছে। ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি তোকে। আবার যখনই আমার মন খারাপ হবে, জীবনের যন্ত্রণাগুলো আমাকে চেপে ধরবে, আমি তখনই ফিরে আসব তোর কাছে। সেদিন আমার পাশে থাকিস কিন্তু।"

জঙ্গলের ভিতর থেকে ভৈরবের গম্ভীর গলায় উত্তর ভেসে এলো, "ভৌউউউউউ।"